স্বস্তিকা

৬৫ বর্ষ, ৩১ সংখ্যা।। ২৫ মার্চ - ২০১৩।। ১১ চৈত্র - ১৪১৯ ।। দাম : সাত টাকা

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন □ ৬-৮

বাংলাদেশের খোদ বিদেশমন্ত্রীই বলছেন, হিন্দুরা বিপন্ন □ ৯

খোলা চিঠি : ৪০০তে ১৮ পেয়েও পাশ মুখ্যমন্ত্রী :
একটা প্রশ্নের জবাব দিতেই হবে □ সুন্দর মৌলিক □ ১১

প্রসঙ্গ গণধর্ষণ □ অসিতবরণ চট্টোপাধ্যায় □ ১২

ভি ভি আই পি হেলিকপ্টার কেনায় দালাল চক্রের হদিশ
অন্য উপায় খুঁজতেই হবে □ মেঃ জেঃ কে কে গঙ্গোপাধ্যায় □ ১৪

আমাদের প্রতিরক্ষা কি দুর্নীতির চোরাবালির উপর
দাঁড়িয়ে? □ সমর পণ্ডিত □ ১৭

হোলি-দোল-বসন্তোৎসব □ সংকর্ষণ মাইতি □ ২০

যিনি রাঁধেন তিনি চুলও বাঁধেন □ প্রীতি বসু □ ২৬

প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম ক্রয়ে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ
বন্ধ হোক □ অশোক মেহেতা □ ২৭

সাঈদীর ফাঁসির রায় তরুণদের বিজয় □ ফারুক যোশী □ ২৯

অন্য চোখে : ধর্মনিরপেক্ষীরা ইসলামের স্বরূপ সম্পর্কে
অবহিত হোন □ চৈতন্য বর্ধন □ ৩১

সিঁদুরে মেঘ এবং উদ্বিগ্ন দেশবাসী □ দেবীপ্রসাদ রায় □ ৩৬

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯ □ □ নবাঙ্কুর : ২৪-২৫ □ □ অন্যরকম : ৩৩ □
পুস্তক প্রসঙ্গ : ৩৫ □ □ সমাবেশ-সমাচার : ৩৮ □ □ রঙ্গম : ৩৯
□ □ শব্দরূপ : ৪০ □ □ প্রাসঙ্গিকী : ৪১

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : নবকুমার ভট্টাচার্য

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

৬৫ বর্ষ ৩১ সংখ্যা, ১১ চৈত্র, ১৪১৯ বঙ্গাব্দ

যুগাব্দ - ৫১১৪, ২৫ মার্চ - ২০১৩

দাম : ৭ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৩২৫ টাকা।

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

কপ্টার কেলেঙ্কারি : পৃঃ ১৪-১৮

দূরভাষ : সম্পাদকীয় : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪,
৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪২

Postal Registration No.-
Kol.RMS/48/2013-2015

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

টেলিফ্যাক্স : (০৩৩) ২২৪১-৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

আর এস এসের প্রতিবেদন

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রতিনিধিসভায় সরকার্যবাহ ভাইয়াজী (সুরেশজী) যোশীর বার্ষিক প্রতিবেদনে গত এক বছরে সঙ্ঘের কাজের হাল-হকিকৎ উঠে এসেছে। সেইসঙ্গে সভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত প্রস্তাবে উঠে এসেছে দুই প্রতিবেশী দেশে নির্যাতীত হিন্দুদের অবস্থাও।

HB ®

INDIA'S NO. 1 IN ISI MARKED HEAVY PIPE FITTINGS

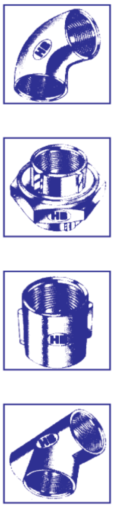

HB ® AN ISO 9002 CERTIFIED CO.

Authorised Distributor

NATIONAL PIPE & SANITARY STORES

54, N. S. Road
Kolkata-700001
Ph : 2210-5831/5833
3, Jadu Nath Dey Road,
Kolkata-12, Ph. 2215-6804,
Fax : 2212-2803

Sister Concern

Partha Sarathi Ceramics

4, College Street,
Kolkata-700012
Ph: 2241 6413 / 5986
Fax : 033-22256803
e-mail : nps@vsnl.net
website ;
www\nationalpipes.com

সানরাইজ ®

সর্ষে পাউডার

SUNRISE PURE ®

স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

পাক-বিরোধিতায় শুধু প্রতিবাদ নয়, প্রতিরোধ চাই

আফজল গুরুর ফাঁসির বিরোধিতা করিয়া পাক-পার্লামেন্টে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। এই দেশে একজন জঙ্গী সন্ত্রাসবাদীর ফাঁসি হইয়াছে আর পাকিস্তানের পার্লামেন্ট সেই সন্ত্রাসবাদীর ফাঁসির বিরোধিতা করিতেছে। পাকিস্তান কি তাহা হইলে ওই সন্ত্রাসবাদীর পৃষ্ঠপোষক? যদি তাহা না হইবে তাহা হইলে এই দেশে একজন সন্ত্রাসবাদীর ফাঁসি লইয়া পাকিস্তানের এত মাথাব্যথা কেন? উল্লেখ্য, পাক-পার্লামেন্টে ভারতে সংসদ হানার মূলচক্রী আফজল গুরুর ফাঁসির বিরোধিতা করিয়া একটি প্রস্তাব আনা হইয়াছে। ওই প্রস্তাবটি আনিয়াছিলেন জামিয়াত ইলেমা-ই-ইসলামের প্রধান মৌলানা ফজলুর রহমান। ওই প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীতও হইয়াছে। প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইবার অর্থ সমগ্র পাকিস্তান রহিয়াছে ওই জঙ্গী সন্ত্রাসবাদীর সমর্থনে। সাম্প্রতিককালেও ভারতীয় জওয়ানের মাথা কাটিয়া লইয়া যাওয়া এবং শ্রীনগরে আধাসামরিক বাহিনীর ক্যাম্পে জঙ্গী হানা সর্বক্ষেত্রেই জড়িত রহিয়াছে পাকিস্তান। কিন্তু ইহার প্রত্যুত্তরে প্রতিটি ক্ষেত্রেই ভারত সরকারের ব্যর্থতা ফুটিয়া উঠিয়াছে। এমনকি আফজলের ফাঁসি লইয়া পাক নিন্দা প্রস্তাবের বিরোধিতার সিদ্ধান্ত লইতেও সরকারের দ্বিধা কাটিতে সময় লাগিয়াছে। প্রধান বিরোধীদল বিজেপি উদ্যোগ না লইলে পাকনিন্দা প্রস্তাব খারিজের কোনও অভিপ্রায় সরকারের ছিল না। এ ব্যাপারে লোকসভায় বিজেপি নোটিশও দিয়াছিল। কিন্তু সরকার প্রথমে সিদ্ধান্ত লইতে পারে নাই। পরে বিজেপির প্রবল বিরোধিতায় পাল্টা প্রস্তাব আনিতে বাধ্য হইয়াছে। পাকিস্তানের ভারত বিরোধী মনোভাব দিন দিন স্পষ্ট হইতেছে অথচ ভারত সরকার এ বিষয়ে নিশ্চুপ, সিদ্ধান্ত হীনতায় ভুগিতেছে। রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা অরুণ জেটলি এই জন্যই বলিয়াছেন, পাক-পার্লামেন্টের প্রস্তাবে স্পষ্ট পাকিস্তানই ভারতে সন্ত্রাস হানার জন্য দায়ী। এইভাবে যদি আন্তর্জাতিক মহলে ভারত অপদস্থ হয়, তাহা হইলে আমাদের বিদেশনীতি লইয়া ভাবিবার সময় আসিয়াছে। বস্তুত প্রতিবেশীর চেয়ে বহু ক্ষেত্রেই ভারত আগাইয়া রহিয়াছে। তবু কিসের জন্য কূটনৈতিক খেলায় এঁটে উঠিতে পারে না ভারত? ইহার জন্য অবশ্যই দায়ী কমনীয় রাষ্ট্রনীতি। আফজল গুরু ভারতীয় নাগরিক। ভারতীয় আইন অনুযায়ী তাহার বিচার ও সাজা হইয়াছে। কিন্তু একজন ভারতীয় নাগরিকের ভারতীয় আদালতে বিচার লইয়া পাকিস্তানের সাংসদরা উদ্বেল কেন? ইহার জন্য দায়ী অপদার্থ কেন্দ্রীয় সরকার। পাকিস্তান প্রতি মুহূর্তে ভারতের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, সমস্ত সন্ত্রাসবাদী হামলার মদতদাতা, অথচ এ বিষয়ে ব্যবস্থা নিতে দ্বিধান্বিত সরকার। পাকিস্তান ভারতের বিরুদ্ধে একটার পর একটা সন্ত্রাসবাদী কাজকর্মে মদত দিয়া চলিয়াছে আর প্রতিবার ভারত সরকার 'জিরো টলারেন্স'-এর শূন্যগর্ভ আস্ফালন করিয়া দায় সারিতেছে। ইহা আর কতদিন চলিতে দেওয়া যায়? কেবল মুসলিম ভোটের লোভে পাকিস্তানের কাছে দেশকেও বিক্রি করিতে দ্বিধা করিবে না এই সরকার। তাই আজমেড় শরিফে ঘটা করিয়া পাক প্রধানমন্ত্রীকে ভোজে আপ্যায়ন করেন বিদেশমন্ত্রী। বিজেপি সভাপতি রাজনাথ সিং ঠিকই বলিয়াছেন, 'পাকিস্তান সহ্যের অন্তিম সীমা লঙ্ঘন করিয়াছে। অবিলম্বে উদ্যোগী হউন প্রধানমন্ত্রী। ফিরাইয়া আনা হউক পাকিস্তানে নিযুক্ত ভারতের হাই কমিশনারকে। বন্ধ করিয়া দেওয়া হউক সমস্ত কূটনৈতিক সম্পর্ক।' কিন্তু এই সরকারের ঘুম ভাঙিবে কি? ভারত কি শুধু প্রতিবাদ করিয়াই চলিবে? প্রতিরোধ করিবে কবে? সোজা আঙুলে ঘি না উঠিলে বাঁকা আঙুলেই তাহা তুলিতে হয়। তাই শুধু প্রতিবাদ নয়, চাই সক্রিয় প্রতিরোধ।

জাতীয় জাগরণের মন্ত্র

তোমরা কি সাম্য, স্বাধীনতা, কার্য ও উৎসাহে ঘোর পাশ্চাত্য এবং ধর্মবিশ্বাস ও সাধনায় ঘোর হিন্দু হতে পার? এটাই করতে হবে এবং আমরাই তা করব। তোমরা সকলে এই কাজ করবার জন্যই এসেছ। আপনাতে বিশ্বাস রাখো। প্রবল বিশ্বাসই বড় বড় কাজের জনক। এগিয়ে যাও, এগিয়ে যাও। মৃত্যু পর্যন্ত গরিব ও পদদলিতদের উপর সহানুভূতি করতে হবে—এই আমাদের মূলমন্ত্র। এগিয়ে যাও, বীরহৃদয় যুবকবৃন্দ!

—স্বামী বিবেকানন্দ।

সন্ত্রাসবাদী তোষণে ওমর আর পিডিপি-র প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ জম্মু-কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লার বিধানসভায় দেওয়া ভাষণে যে কোনও ভারতীয় নাগরিকই ধন্দে পড়ে যেতে পারে। সংবাদে প্রকাশ জম্মু-কাশ্মীর বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী ওমর ভারতের সংসদ আক্রমণের মূল ষড়যন্ত্রী মৃত আফজল গুরুর নামের আগে সম্মানসূচক 'সাহেব' সম্বোধন করেছেন। কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদীদের সমব্যথী নাগরিকদের মধ্যে অনেকের ধারণায় মুখ্যমন্ত্রী ওমর আফজল গুরুর ফাঁসিতে অনুমোদন দিয়েছিলেন, এমন একটা ভাবনাকে দূর করতেই তিনি (ওমর) উঠে পড়ে লেগেছেন। অবশ্য

ওমরের এই জঘন্য কাজে অন্তত মৌখিকভাবে কাশ্মীর সরকারের জোটসঙ্গী কংগ্রেস ক্রুদ্ধ প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে। কংগ্রেসী মুখপাত্র ও জোট সরকারের মন্ত্রী শ্যামলাল শর্মা তাঁর বক্তব্যে জানিয়েছেন 'এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক যে পাকিস্তানের সংসদ ও পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরের বিধানসভা যখন আফজল গুরুর ফাঁসির বিরুদ্ধে নিন্দা প্রস্তাব নিয়েছে সেই একই সন্ত্রাসবাদীকে ভারতের একটি রাজ্যের প্রধান গৌরবান্বিত করার একইরকম অপচেষ্টা করছেন'। এই মর্মে শর্মা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, এমন একজন সন্ত্রাসবাদীর ফাঁসির প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের শতকরা একশ ভাগ সহমত পোষণ করাই রীতি। কেননা সন্ত্রাসবাদীর ফাঁসি সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের আদেশ অনুসারে পালিত হয়েছে মাত্র; এ নিয়ে বিধানসভায় আলোচনাই অনৈতিক।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ২০১৪ সালে অনুষ্ঠিতব্য সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কালে গুরুর ফাঁসির বিষয়টি উপত্যকার বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠী ও মূল ধারার দলগুলির মধ্যে আবেগকে কাজে লাগিয়ে ফয়দা লোটার গরমাগরম বিষয় হয়ে উঠেছে।

ইতিমধ্যে বিরোধী মুফতি মহম্মদ সইদের পি ডি পি দল প্রধানমন্ত্রীকে গুরুর পরিবারকে তার দেহ ফেরত দেওয়ার আবেদন জানিয়ে চিঠি দিয়েছে। সূত্র অনুযায়ী মনে করা হচ্ছে তাঁকে টেক্কা দিতেই গুরুর নামের আগে 'সাহেব' বসানই শুধু নয়, ওমর গুরুর দেহের সঙ্গে জে কে এল এফ-এর প্রতিষ্ঠাতা ১৯৮৪ সালে ফাঁসি হয়ে যাওয়া ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসবাদী তিহার জেলে কবরস্থ মকবুল ভাটের দেহও ফেরতের আবেদন জানিয়েছেন। ওয়াকিবহাল মহলের খবর অনুযায়ী আসন্ন নির্বাচনে ওমর তাঁর নির্বাচনকেন্দ্র 'গাণ্ডেরবল'-এর আসন নিয়ে আদৌ আশাবাদী নন। ভোট রাজনীতির তাগিদে তাই তিনি এমন নগ্ন প্রতিযোগিতামূলক দেশবিরোধী সন্ত্রাসবাদী তোষণে লিপ্ত হয়েছেন।

চীনা অনুগত বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর ভূটান সফরে নিষেধাজ্ঞা

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ শীর্ষস্থানীয় বৌদ্ধ সন্ন্যাসী তাই সিতু-র ভূটান সফরের অনুরোধ কেন্দ্র সরকার বাতিল করে দিয়েছে। সম্প্রতি তাই সিতু এক চিঠিতে সরকারকে এই মর্মে অনুরোধ জানায় যে তাঁকে ভূটানের বৌদ্ধ মঠ বা গুম্ফাগুলিতে পরিদর্শনের এবং সেখান থেকে ভারতে ফিরে আসার অনুমতি দেওয়া হোক। উল্লেখ্য, তিব্বতীদের ধর্মগুরু দলাই লামা কখনও ভূটানে যাননি, যদিও বহু তিব্বতীই ভূটানে রয়েছেন। এমনকী ভূটানও তাই সিতু-র ভূটান ভ্রমণ নিয়ে অত্যন্ত সতর্ক, যদিও তাই সিতু-র ভূটানী পাসপোর্ট রয়েছে।

প্রাপ্ত সূত্র অনুসারে তাই সিতুকে ভূটানে যাওয়ার অনুমতি দিলে তাঁর যাতায়াতের উপর যে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে তা শিথিল করা হলো বলে ব্যাখ্যার সুযোগ রয়েছে। তাই সিতু এবং ত্রিনলে দোরজি (বর্তমান করমাপা (Karmapa)-র চীনের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে বলে ওয়াকিবহাল মহল মনে করেন। যদিও দোরজি দলাই লামার আশীর্বাদধন্য। তাদের এই আশংকা আরও ঘনীভূত হয় ২০১১ সালে হিমাচল প্রদেশে তার গুম্ফায় হিসাব বহির্ভূত বিদেশী ৮ কোটি টাকা মূল্যের বিদেশী অর্থের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল। তখন এই ঘটনার সংশ্লিষ্ট কয়েকজন বিদেশীকে গ্রেপ্তার করা হয়। দোরজি গৃহবন্দী হন। এইসবের পরিপ্রেক্ষিতে তিব্বতী বৌদ্ধ সন্ন্যাসী তাই সিতুকে নিয়ে কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্ত বলে মনে করা গেছে।

সংবাদ প্রতিবেদন

হিন্দু শরণার্থীদের ন্যূনতম চাহিদাটুকু মেটাক সরকার : আর এস এস

জয়পুরে প্রতিনিধি সভার বৈঠক।

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ প্রতি বছরের মতো এবছরও রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভার বৈঠক গত ১৫ থেকে ১৭ মার্চ জয়পুরে হয়ে গেল। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মোট ১৩৯৫ জন কার্যকর্তা এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক মোহনরাও ভাগবত, সরকার্যবাহ ভাইয়াজী যোশী সহ সঙ্ঘের কেন্দ্রীয় কার্যকারিণী মণ্ডলের সদস্যরা এবং বিভাগ প্রচারকরাও এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। ১৫ মার্চ ভারতমাতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ ও প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে বৈঠকের শুভ সূচনা করেন সরসঙ্ঘচালক মোহনরাও ভাগবত। এরপর গত এক বছরে দেশের যেসব বিশিষ্ট ব্যক্তি ও সঙ্ঘের দায়িত্বশীল কার্যকর্তা প্রয়াত হয়েছেন তাঁদের স্মরণে শোকপ্রকাশ করা হয়।

সরকার্যবাহ সুরেশ যোশী (ভাইয়াজী) তাঁর পেশ করা বার্ষিক প্রতিবেদনে জানান, সঙ্ঘ কাজের দৃষ্টিতে সঙ্ঘশিক্ষাবর্গ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গত বছর দেশের বিভিন্ন প্রান্তে অনুষ্ঠিত ৫২টি সঙ্ঘশিক্ষাবর্গে ১০৬৫১ স্থান থেকে ১৮৬০১ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন। সারাদেশে ২৮৭৮৮ স্থানে ৪২৯৮১টি শাখা এখন চলছে। এছাড়া ৯৫৫৭ স্থানে সাপ্তাহিক মিলন ও ৭১৭৮ স্থানে সঙ্ঘমণ্ডলী চলছে।

সহসরকার্যবাহ দত্তাত্রেয় হোসবালে জানান, বৈঠকের শেষে একটি প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। এর মূল বিষয় হলো হিন্দু অভিবাসন-কারীদের দুর্দশা। ভারত ভাগের ষাট বছর পরেও পূর্ব পাকিস্তান (পরবর্তীতে বাংলাদেশ) এবং পশ্চিম পাকিস্তান থেকে লক্ষ লক্ষ হিন্দু উদ্বাস্তু হিসেবে এদেশে আশ্রয় নিচ্ছেন। যেহেতু ওই দেশগুলিতে হিন্দুদের অবস্থা ক্রমশ শোচনীয় হয়ে পড়ছে। তিনি বলেন, আমাদের গৃহীত প্রস্তাবে সরকারকে এদের দৈনন্দিন ন্যূনতম প্রয়োজনটুকুর চাহিদা মেটাতে নিশ্চিত ব্যবস্থা অবলম্বন করতে বলা হয়েছে এবং অভিবাসীদের বিষয়ে চুক্তি সংক্রান্ত স্বচ্ছ নীতি প্রণয়নের দাবিও রাখা হয়েছে সরকারের কাছে।

আয়কর ট্রাইব্যুনালের কণ্ঠে আর এস এসের সুর

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ শিব, দুর্গা কিংবা হনুমানের উপাসনা কোনও ধর্মীয় রীতি-নীতি পালন নয়, বরং মহাবিশ্বের অতি-প্রাকৃত শক্তির আরাধনা। হিন্দুধর্মও কোনও তথাকথিত ধর্ম (পড়ুন উপাসনা-পদ্ধতি) নয়, কিন্তু এখান থেকে উৎসারিত দর্শন ও ঐতিহ্য বিশ্বব্যাপী ব্যাপ্ত হয়েছে। না, এটা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বক্তব্য নয়, এটা আয়কর দপ্তরের ট্রাইব্যুনালের মন্তব্য। যদিও এই মন্তব্যে আর এস এসের এতদিন ধরে বলে আসা কথারই অনুরণন দেখেছে তথ্যাভিজ্ঞ মহল। ঘটনার সূত্রপাত নাগপুরের শিব মন্দির দেবস্থান পঞ্চ কমিটি সংস্থানের আবেদনকে কেন্দ্র করে। সংস্থাটির পরিচালনাধীন মন্দিরের ধর্মীয় সক্রিয়তা এই 'গ্রাউন্ডে' মোট ব্যয়ের নিরিখে ৫ শতাংশ কর-ছাড়ের আবেদন নাকচ করে দেয় আয়কর কমিশনারের আদেশনামা। তার পরিপ্রেক্ষিতেই দপ্তরের বিশেষ ট্রাইব্যুনাল ওই কথাগুলি বলেন।

প্রকৃতপক্ষে আয়কর দপ্তরের ট্রাইব্যুনালের কথাগুলি অভিনব মনে হলেও আর এস এস তার প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই এই কথাগুলোই বলে আসছে। ইদানীং ইসলাম ও খৃস্টান উপাসনা-পদ্ধতির আগ্রাসনের পরিপ্রেক্ষিতে কোনও কোনও মহল হিন্দুধর্মকেও সেমিটিকরূপ দিতে মরিয়া। সঙ্ঘ বরাবরই মনে করেছে ভারতবর্ষের মানুষের একাধিক উপাসনা পদ্ধতি থাকতেই পারে কিন্তু ধর্ম অর্থাৎ জীবন-যাপনের মূল্যবোধ বা জীবন-পদ্ধতি একইরকম, সেটি হিন্দুত্ব। আজ কংগ্রেস শাসিত দেশে ও রাজ্যে (অর্থাৎ মহারাষ্ট্রে) একটি প্রবল প্রতাপান্বিত সরকারি সংস্থা যেভাবে প্রকারান্তরে আর এস এসের মতকেই স্বীকার করে নিল তাকে শুভ বুদ্ধির উদয় হিসেবেই দেখছেন বিশেষজ্ঞ মহল।

ট্রাইব্যুনালটি এও মনে করেছে যে হিন্দুধর্ম কোনও বিশেষ সম্প্রদায়ের কুক্ষিগত নয়, সত্যের অনুসন্ধানে বিভিন্ন মত ও পথের মানুষজনই এই ধর্মেরই অন্তর্ভুক্ত। ইতিপূর্বে সুপ্রিম কোর্ট এক রায়ে হিন্দুধর্মকে 'জীবন-পদ্ধতি' (ওয়ে অফ লাইফ) এবং ভারতের সাধারণ সংস্কৃতি (কমন কালচার অফ ইন্ডিয়া) বলে বর্ণনা করেছিল। আয়কর ট্রাইব্যুনালের রায়ও ভারতের সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের আদেশকেই শিরোধার্য করল বলে মনে করা হচ্ছে।

সংবাদ প্রতিবেদন

হেলিকপ্টার ঘুষকাণ্ডে সিবিআই ত্যাগীর কালো টাকার খুব কাছাকাছি

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ভূতপূর্ব ভারতীয় বায়ুসেনা প্রধান এস পি ত্যাগীর নানান বিষয়সম্পত্তি ও বিভিন্ন ব্যাঙ্কে বিনিয়োগের নাগাল পেতে সিবিআই হন্যে হয়ে ঘুরছে। তারা ত্যাগীর মূলত ২০০৪-০৫ সালের পরের অর্থ বিনিয়োগের ওপর জোর দিচ্ছে যাতে ঘুষের টাকা সর্বশেষ কোথায় গিয়ে ঠেকেছে সে ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যায়। সংবাদসূত্র অনুযায়ী সিবিআই ইতিমধ্যেই (১) ঘুষ দেনেওয়ালা (Augusta Westland), (২) ঘুষ লেনেওয়ালা (এম পি ত্যাগীর খুড়তুতো, জ্যাঠতুতো মহাজনেরা), (৩) লেনদেন ঘটিয়ে দেওয়ার মাঝখানের দালালরা (ওইকো হাসচেকে আর কার্লো মেরোসা হ্যাঁ, দু'টিই ইটালিয়ান), (৪) ঘুষের পরিমাণ, (৫) কিছুটা হলেও কোন পিচ্ছিল পথে ঘুষ চলাচল করেছে— এই বিষয়গুলি চিহ্নিত করতে পেরেছে। সিবিআই এখন প্রধানত ত্যাগী-সাহেবের তিন (জুলি, ডকমা, সন্দীপ) ভাইবোনের হাত ঘুরে টাকাটা কোথায় গিয়ে থেমেছে, ভাই-বোনদের সেই গতিপথের সুলুক সন্ধানে ব্যস্ত।

এস পি ত্যাগী

সূত্র মোতাবেক সিবিআই টিউনিসিয়া ও অন্য কয়েকটি দেশের ব্যাঙ্কে ঘুষের টাকা পৌঁছনোর ব্যাপারে অনেকটাই নিশ্চিত হওয়ার পর বর্তমানে সেই অর্থ সর্বশেষ কোন পথে ত্যাগীর হাতে পৌঁছেছে সেটিই অনুসন্ধান করছে।

সিবিআই-এর অনুমান অনুযায়ী শুধু ত্যাগী নয় তারা অন্যান্য বায়ু সেনা অধিকর্তা ও প্রতিরক্ষা দপ্তরের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের ভূমিকা নিয়েও টানা-হেঁচড়া করবে। এই মর্মে গত সপ্তাহেই তারা আলোচ্য চুক্তি সংক্রান্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বেশকিছু নথিপত্র হাতে পাচ্ছে বলে প্রকাশ। তদন্তকারী সংস্থার বক্তব্য অনুযায়ী ২০০৪ সালে (এস পি ত্যাগী বায়ুসেনা কর্তা হবার আগেই) ত্যাগী ভায়েদের খাতায় দু' লপ্তে ১.২৬ লক্ষ ও ২ লক্ষ ইউরো যে জমা পড়েছিল তার নিশ্চিত প্রমাণ মিলেছে। ত্যাগী-ভায়েরা অবশ্য ব্যাপারটা এড়িয়ে যেতে সংস্থাকে জানিয়েছে ওই টাকা তারা হাসচেকের (দালাল) কাছ থেকে কনসালটেন্সি ফি বাবদ পেয়েছে। জাল কেটে বেরোতে এখন কাকে কনসালটেন্সি ফি দিতে হবে সেটাই দেখার।

QARYAT AL NIKHIL TECH. CONT. LLC

&

NITU CONSTRUCTION

N R SARKAR

Managing Director

Mobile : +971508456951
P. O. Box : 73410, Sharjah : U.A.E., Dubai

Email : alnikhil.tech@yahoo.com
nituconstraction@yahoo.co.in

বাংলাদেশের খোদ বিদেশমন্ত্রীই বলছেন, হিন্দুরা বিপন্ন

বাংলাদেশে হিন্দুদের অস্তিত্বই মুছে দেওয়ার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র চলছে। কথাটা আমার নয়। বলেছেন বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী দীপু মণি। গত সপ্তাহে ঢাকাতে বিভিন্ন দেশের কূটনৈতিক প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকে দেশজুড়ে হিংসা ও অশান্তির কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে দীপু মণি বলেন, বাংলাদেশে জামাত-ই-ইসলামি এবং তার অনুগত ছাত্র সংস্থা ইসলামি ছাত্র শিবির রীতিমতো পরিকল্পনা করে হিন্দু সম্পত্তি দখল করতে দেশে দাঙ্গা লাগিয়েছে। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি জামাতের দুর্বৃত্ত কসাই দেলওয়ার হুসেন সইদির প্রাণদণ্ডের আদেশ বিশেষ আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনাল ঘোষণা করার পর বাংলাদেশ জুড়ে প্রতিদিন দাঙ্গা হাঙ্গামা চলছে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় ওই সইদি পাক সেনার চর ছিল। তার কাজই ছিল বেছে বেছে স্বচ্ছল হিন্দু পরিবারের পুরুষদের হত্যা করে হিন্দু নারীদের পাক সেনাব্যারাকে পাঠানো। সইদি ও তার দলবল হাজার হাজার হিন্দুকে প্রকাশ্য দিবালোকে হত্যা করেছিল। ভয়ঙ্কর সেইসব হত্যার ও হিন্দু নারী ধর্ষণের দৃশ্য সইদির নির্দেশে তার সাঙাৎরা ক্যামেরাবন্দি করে। মুজিব-পরবর্তীকালে সেইসব ছবি দেখিয়ে সন্ত্রাসবাদী ইসলামি দল জামাতের সহসভাপতি হয় সইদি। বেগম খালেদা জিয়ার বি এন পি দল ক্ষমতায় এলে বাংলাদেশের মৌলবাদী মুসলমানদের প্রতিনিধি হিসাবে সইদি মন্ত্রী বনে যায়। সইদির নেতৃত্বে শুরু হয়ে যায় দেশজুড়ে হিন্দু নিধন। রাজাকার সইদি ও তার দলবলের অমানুষিক নির্যাতনে হিন্দু পরিবারেরা দলে দলে সীমান্ত পেরিয়ে পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরায় আশ্রয় নেন। এই সেই সইদি যার প্রভাবে খালেদা জিয়া সরকার আইন করেছিল ইসলাম কবুল না করলে হিন্দুরা পিতৃ-সম্পত্তির অধিকার পাবেন না। বাংলাদেশের হিন্দুদের সরকারি পদে যোগদানের অধিকারও খর্ব করা হয়। পশ্চিমবঙ্গে বাম সরকার ও মমতার পরিবর্তনের সরকার মুসলিমদের সরকারি চাকরিতে সংরক্ষণ দেওয়ার যখন প্রতিযোগিতা চালাচ্ছে তখন বাংলাদেশে আজও ১ শতাংশ হিন্দুকে সরকারি চাকরি দেওয়া হয় না। ইসলাম আজও বাংলাদেশের রাষ্ট্রধর্ম। সরকারি উচ্চপদে হিন্দুদের বসার অধিকার নেই। এই বাস্তব ছবিটা ভারতের হিন্দুরা জেনেও না জানার ভান করে নিজেদের ঠকিয়ে চলেছেন।

বাংলাদেশের বিদেশ মন্ত্রী দীপু মণি তার বিবৃতিতে বলেছেন, 'বাংলাদেশের হিংসায় জামাতের সমর্থকরা কমপক্ষে ৪৭টি প্রাচীন হিন্দু মন্দির ধ্বংস করেছে। আগুনে পুড়িয়ে ছাই করে দেওয়া হয়েছে ৭০০টি হিন্দু বাড়ি ও সম্পত্তি। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে চট্টগ্রামের দক্ষিণ-পূর্ব এলাকা, নোয়াখালি, সাতক্ষীরা ও সিরাজগঞ্জে বসবাসকারী হিন্দুরা। ভারতীয় সংবাদসংস্থা পি টি আই জানিয়েছে, ভারতের রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায় যখন বাংলাদেশ সফরে এসেছিলেন সেই সময় ভারত বিরোধী জিগির তুলে চট্টগ্রামের বাঁশখালি এলাকায় জামাত নেতা ও বাঁশখালি উপজেলার চেয়ারম্যান আলমগীর কবীর চৌধুরির নেতৃত্বে পরিকল্পিতভাবে সেখানের হিন্দু বাড়ি ও মন্দিরে ভয়াবহ আক্রমণ চালায় ইসলামি ছাত্র শিবিরের দুর্বৃত্তরা। একটিও হিন্দু বাড়ি ও মন্দির রক্ষা পায়নি। ঘটনার দুই সপ্তাহ পরে ঢাকার নির্দেশে আলমগীরকে পুলিশ গ্রেফতার করে। এর জন্য বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যমকে ধন্যবাদ জানাতে হয়। বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যম ভারতের তুলনায় অনেক বেশি স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে কাজ করে। পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার ক্যানিংয়ে সশস্ত্র জামাত সমর্থকরা দাঙ্গা বাধালে কলকাতার সংবাদমাধ্যম সমস্ত ঘটনা চেপে দেয় তখন ঢাকার খবরের কাগজগুলি নির্ভীকভাবে হিন্দুদের উপর জামাতের বর্বর আক্রমণের কড়া সমালোচনা করে।

গূঢ়পুরুষের

কলম

বাংলাদেশে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল শাখার মুখপাত্র আব্বাস ফইয়াজ এক বিবৃতিতে বলেছেন, 'এই মুহূর্তে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের জীবন ও সম্পত্তি বিপন্ন। বেঁচে থাকার আশা ত্যাগ করে এখানে হিন্দুরা দিন কাটাচ্ছেন। প্রতিদিন অসংখ্য হিন্দু পরিবার দেশত্যাগ করে ভারতে চলে যাচ্ছেন। বাংলাদেশের ১৫ কোটি ৩০ লক্ষ জনসংখ্যার মধ্যে হিন্দুদের সংখ্যা এখন ৮ শতাংশে নেমে গেছে। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হন হিন্দুরা। রাজাকারদের লক্ষ্যই ছিল হিন্দু নিধন ও তাঁদের সম্পত্তি দখল করা। প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত রাজাকার সইদি ২০০১ সালে আওয়ামি লিগকে নির্বাচনে হারাতে হাজার হাজার হিন্দুকে হত্যা করে সন্ত্রাস ছড়িয়ে ছিল। তখন সইদি এবং তার দল জামাত প্রচার চালায় যে হিন্দুরা আওয়ামি লিগের সমর্থক। জামাতের সন্ত্রাসে বাংলাদেশের ২০০১ সালের নির্বাচনে হিন্দুরা ভোটই দিতে পারেনি। এর পুরস্কার দেওয়া হয় কুখ্যাত রাজাকার সইদিকে মন্ত্রী করে। এই সইদির চ্যালা আলমগীর ও তার সাগরেদরা বাঁশখালিতে ৭০ জন হিন্দুকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে। আলমগীর ও তার দলবলকে এবার পুলিশ গ্রেফতার করলেও এখনও বিচার হয়নি। হিন্দুদের উপর এতটাই নির্মম অত্যাচার চলছে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় যে বিরোধী দলনেত্রী খালেদা জিয়াকেও নিন্দা করতে হয়েছে। খালেদা বলেছেন, শান্তিপ্রিয় হিন্দুদের উপর এমন বর্বর অত্যাচার মেনে নেওয়া যায় না। ক্ষতিগ্রস্ত সমস্ত হিন্দু পরিবারকে অবিলম্বে সরকারি ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। ঢাকা হাইকোর্টও আওয়ামি লিগ সরকারকে নির্দেশ দিয়েছে ক্ষতিগ্রস্ত হিন্দুদের সরকারি খরচে ঘরবাড়ি মন্দির পুনর্নির্মাণ করে দিতে হবে। প্রশ্ন থাকছে ক্ষতিপূরণই শেষ কথা নয়। হিন্দুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করাটাও সরকারের দায়।

মোদির উন্নয়নমুখী কাজকে সমর্থন জানাচ্ছেন মুসলমানরাও

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গুজরাটের যেসব এলাকা মুসলমান প্রধান সেখানকার অধিবাসীদের সমর্থন পাওয়ার আশা কংগ্রেস করলেও তা মেলেনি। মুসলমান নাগরিকরা গত মাসে এবারের পুর ভোটে সমর্থন জানিয়েছে ভারতীয় জনতা পার্টিকে। বিজেপির সমস্ত প্রার্থীই ছিল মুসলমান। কংগ্রেসী প্রার্থীরা শুধু হারেনি প্রতিদ্বন্দ্বীদের কাছে, তাদের জামানতও বাজেয়াপ্ত হয়েছে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে যে জায়গা ছিল কংগ্রেসের নিশ্চিন্ত ঘাঁটি, এখন সেখানে ভারতীয় জনতা পার্টির অনুকূলে তাজা বাতাস বইছে। এই ব্যাপারটা ঘটেছে সালায়া শহরে।

ভারতের পশ্চিম উপকূলে জামনগরের কাছে এই সালায়া শহরে বসবাস ৪৫ হাজার মানুষের। তার মধ্যে ৯০ শতাংশই মুসলমান। অবশ্য শুধু সালায়ার ব্যাপারটা কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এখন সারা রাজ্যে দেখা যাচ্ছে মুসলমান ভোটাররা বিজেপিকে সর্বত্র সমর্থন জানাচ্ছেন। ৭৬টি পুরসভার ভোটে দেখা গেছে মুসলমান ভোটাররা বিজেপি-র পক্ষে। ১৪৫ জন প্রার্থী দলের পক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। জয়ী হন ৮১ জন। কোদিনার পুরসভায় বিজেপি-র পক্ষে। ভোটে দাঁড়ান আট জন মুসলমান প্রার্থী। প্রত্যেকেই জয়ী হয়েছেন। জুনাগড়ের কাছে পুরসভায় দুজন মুসলমান প্রার্থী ছিলেন বিজেপি-র পক্ষে তারা পুনর্নির্বাচিত হয়েছেন।

সালায়াতে জমি তৈরি হয়েছিল ২০১০ সালে। সে সময় বিজেপি-র নেতা বিজয় রূপানি ও দলের সংখ্যালঘু শাখার নেতা কদারে সলেট গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্রমোদীর উন্নয়নের বার্তা নিয়ে। নগরের ভোটাররা বলেছেন, নগরবাসীরা পুরসভার কাছ থেকে অনেকরকম সুযোগ-সুবিধে পেয়েছেন। কয়েক বছর আগেও যেখানে কাঁচা রাস্তা ছিল না এখন সেই শহরে ১২ কিলোমিটার জুড়ে কংক্রিটের পথ। পয়ঃপ্রণালীর কোনও ব্যবস্থা ছিল না, এখন নগরের ৪০ শতাংশ এলাকায় ঢাকা নিকাশী ব্যবস্থা চালু হয়েছে। সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চলে সমস্যা ছিল জলের। অতিরিক্ত নোনা জল ছিল, দূর থেকে জল আনতে হোত। এখন পুরসভা নাগরিকদের নাগালের মধ্যে এসেছে মিষ্টি জল।

আমাদের নেতাদের স্বভাব প্রতিশ্রুতি দেওয়া আর বাস্তবে কিছু না করা। মোদি সেই ঘরানাকে উল্টোমুখী করেছেন ভেঙে দিয়ে। বলেছেন এক নবীন বিজেপি কাউনসিলার মুসা আব্বাস। শুধু হিন্দুরা নয়, মুসলমানরাও সমর্থন জানিয়েছেন উন্নত গুজরাট গড়ে তোলার স্বার্থে। তারা দেখছেন নরেন্দ্র মোদির ঐকান্তিক সদ্‌ভাবনা ও উদ্যোগে কীভাবে গুজরাটে সর্বস্তরে পালাবদল ঘটছে।

ডঃ নজরুল ইসলাম রচিত
মুসলমানের করণীয়
পুস্তকের জবাবে

হিন্দুর করণীয়

নিত্যরঞ্জন দাস

মূল্য ঃ ৫০.০০ (পঞ্চাশ টাকা মাত্র)

Design's For Modern Living
Neycer
NATIONAL PIPE & SANITARY STORES
Sales Office : 3, Jadu Nath Dey Road, Kolkata-12,
Ph. 2215-6804, Fax : 2212-2803
54, N. S. Road. Kolkata-700001. Ph. : 2210-5831 / 33

৪০০-তে ১৮ পেয়েও পাশ মুখ্যমন্ত্রী ১টা প্রশ্নের জবাব দিতেই হবে

মাননীয় সূর্যকান্ত মিশ্র
বিরোধী দলনেতা
পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা

প্রথমেই আপনাকে একটা আক্রমণাত্মক প্রশ্ন করি। আপনারা কি শুনতে পান না? নাকি শুনেও শুনতে পান না? এই যে মুখ্যমন্ত্রী গোটা রাজ্য জুড়ে এত কথা বলছেন, সবই তো বলছেন তাতেও আপনাদের কৌতুহল মেটে না কেন বলতে পারেন? এ ব্যাপারে আপনারা আবার সঙ্গী করেছেন কংগ্রেস, এসইউসিআই সহ সব বিরোধী দলকে।

কেন এসব প্রশ্ন করছি ভাবছেন তো! জানতাম ভাববেন। না, বলে দিলে বুঝবেন না সেটা বুঝেছি। এবার বলেই দিই। বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রীর জন্য কিনা ৪০০টা প্রশ্ন জমা পড়েছিল। শুনেই তো আমার মাথা খারাপ হওয়ার জোগাড়। এত প্রশ্ন আপনাদের আসে কী করে? আপনাদের মায়া হয় না?

সারাটা বছর একের পর এক জেলা সফর করে বই থেকে মাটি নানা উৎসব করে, ছবি এঁকে, কবিতা লিখে যেই মানুষটা রাজ্যের ভাবমূর্তি বদলানোর একের পর এক চেষ্টা করে চলেছেন তাঁকে কেউ এত প্রশ্ন করে?

ভাবুন, মুখ্যমন্ত্রীর হাতে যে দফতরগুলো আছে সেগুলোর সংখ্যা নয় নয় করেও দশ (স্বরাষ্ট্র-পুলিশ, ভূমি, তথ্য-সংস্কৃতি, পার্বত্য বিষয়ক, সংখ্যালঘু, স্বাস্থ্য ইত্যাদি)। এগুলো তো নামে, আসলে অর্থ থেকে ক্রীড়া, শিক্ষা থেকে কৃষি তিনিই তো সব সামলান। এই যে রাজ্য বাজেট পেশ করা হলো সেটা কার বানানো বলুন তো? অমনি অমিত মিত্রর নাম

ভাবছেন? জানতাম ভাববেন। আসলে মশাই মোটেও তা নয়। কলেজে ছাত্র সংসদ নির্বাচন বন্ধ রাখা থেকে এবার আমের ফলন কেমন হবে সবই তাঁর মাথা থেকে বের হয়। আমাদের দিদি একাই ১০০০০০০০০০। সত্যি সত্যি শূন্য দেওয়ার ব্যাপারে আমার কোনও কার্পণ্য নেই। চাইলে আরও দিতেই পারেন।

তবে দিদিও কম যান না। আপনারা চাইলেই হবে নাকি। মা-মাটি-মানুষের সমর্থন নিয়ে তিনি ক্ষমতায় এসেছেন। সেই মা, সেই মাটি কিংবা সেই মানুষ কোনও প্রশ্ন করলে তিনি উত্তর দিতেন। ৪০০ কেন চার লক্ষ প্রশ্নের উত্তর দিতেন। কিন্তু আপনারা কোন হরিদাস পাল মশাই? তাই মুখ্যমন্ত্রী বেছে বেছে (মাছের কাঁটা বাছার মতো, গলায় যাতে না ফুটে যায়) ১৮টি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। আর তাতেই তিনি পাশ। আসলে তাঁকে পাশ করানোর মাস্টার সেই একজনই। সরি তিনজন। মা-মাটি-মানুষ।

আপনাদের প্রশ্নের উত্তর পেলেন কি না পেলেন তা নিয়ে আমার মাথা ব্যথা নেই। তবে মা-মাটি-মানুষের হয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে আমি একটি প্রশ্নই উত্থাপন করব। ব্যস্ত দিদিমনি জবাব দিলেও খুশি, না দিলে আরও খুশি। বুঝব উনি ব্যস্ত তাই দিতে পারেননি। একটিবারের জন্যও ভাবব না যে তাঁর কাছে উত্তর নেই।

রাজ্যের একটার পর একটা এলাকা দিন দিন বাংলাদেশ হয়ে যাচ্ছে। বেশ কিছু এলাকাকে মিনি পাকিস্তানও বলা যায়। এর ওপর আপনি অনুপ্রবেশকারীদের পাকাপাকি থাকার ব্যবস্থাও নাকি করে দিচ্ছেন? এটা কি সত্যি? বাংলা মায়ের ওপর আবার বলাৎকার হবে না তো?

সুন্দর মৌলিক

প্রসঙ্গ গণধর্ষণ

অসিত বরণ চট্টোপাধ্যায়

১৬ ডিসেম্বর দু হাজার বারো। গোটা ভারত যেন চমকে উঠে দেখল খোদ রাজধানী দিল্লীতে বীভৎস নারকীয় গণধর্ষণ হয়েছে। তারপর যেমন হয়— প্রতিবাদ মিছিল, ধরনা, কাগজে ছি ছি বকার, মান্যগণ্য জনেদের মন্তব্য ইত্যাদি ইত্যাদি চলল কিছুদিন। সুচিকিৎসার জন্য বিদেশে পাঠান হলো মরণাপন্ন ধর্ষিতাকে। সেখানেই মৃত্যু হলো তাঁর। সরকার চুক চুক করে শোক জানিয়ে হাত ধুয়ে ফেলল। ব্যাপারটা এমন দাঁড়াল যেন ভারতের মাটিতে এর আগে ধর্ষণ হয়নি। গণধর্ষণ কথাটা যেন ভারতবাসীর অজানা। অবশ্য গণধর্ষণ শব্দ জোড়টির বয়স খুব বেশি নয়। তবে খুব কমদিনও নয়। মনে পড়ে দু হাজার বার সালের ৫ ফেব্রুয়ারি পার্কস্ট্রিটের পার্কিং লট থেকে গাড়িতে তুলে নেওয়া হলো এ্যাংলো ইন্ডিয়ান মহিলাকে। চলন্ত গাড়িতে চলল গণধর্ষণ। সেদিন এমনটা না হলেও পশ্চিমবঙ্গে অনেক জল ঘোলা হয়েছে। দুটি গণধর্ষণের সময়ের তফাৎ এক বছর। তার মাঝেই আরও অনেক মহিলা, কিশোরী ধর্ষিতা হয়েছেন। সংবাদপত্রে সংবাদ হয়েই তার কাজ শেষ। পার্কস্ট্রিটে হয়তো-বা একটু মূল্য পেতো কেননা গোয়েন্দা প্রধান দময়ন্তী সেন একে ধর্ষণ বলেই বিবৃতি দিয়েছিলেন। কিন্তু মহামান্য মুখ্যমন্ত্রী 'সাজানো' বলে বিবৃতি দিয়ে নস্যাৎ করে দিলেন। দিল্লীর কাণ্ডের পর দেখছি পার্কস্ট্রিট আবার জেগে উঠেছে। বিদ্বজ্জনের মিছিল বেরিয়েছে, বাদ-প্রতিবাদ নূতন করে শুরু হয়েছে। সম্ভবত পশ্চিমবঙ্গ লজ্জা পেয়েছে— দিল্লী কয়েকদিনের মধ্যেই অপরাধীদের ধরে ফেলল, চার্জশীট প্রস্তুত করে ফেলল, শুনানি শুরু হয়ে গেল। পার্কস্ট্রিটের ব্যাপারটা আলস্যের জন্য হয়ে উঠেনি। তাই নূতন করে গা ঝাড়া দিয়ে উঠেছে পশ্চিমবঙ্গের মুষ্টিমেয় বিদ্বজ্জন যাঁরা প্রায়ই রঙীন পোষাক পরে থাকেন।

লক্ষণীয়, পার্কস্ট্রিটের সঙ্গে দিল্লীর কাণ্ডের ঘটনার মিল অনেক গরমিলও অনেক কিন্তু একটা মিল দেখে মনে হয় এটা যেন ভারতের সমাজচিত্রের ভবিষ্যতের একটি সংকেত। সেটা হলো দুটি ধর্ষণই চলন্ত গাড়িতে। মনে হয় ভারতে এটা চলতেই থাকবে।

পার্কস্ট্রিট এবং দিল্লী নিয়ে যত মিটিং মিছিল লেখালেখি হয়েছে তার একটি মাত্র মূলকথা অপরাধীদের গ্রেপ্তার এবং দৃষ্টান্তযোগ্য শাস্তি চাই। একজন কেউ বলেছেন বলে মনে পড়ে না যে, সমাজে যেসব দুর্বলতার জায়গা দিয়ে এই বীভৎসতা রূপ পাচ্ছে, তাকে সংস্কার করতে হবে। ধরাপড়া না পড়া কয়েকজন মাত্র অপরাধীর সাজা দিলেই এঘটনার স্রোত থামবে না। ১৬ ডিসেম্বর দু' হাজার বারোর পর থেকে আজ পর্যন্ত এমন একদিনও যায়নি যেদিন কাগজে ধর্ষণের কোনও খবর নেই। স্পষ্ট করে বললে বলতে হয়, পিশাচ যেন তার ঝুলি থেকে যত রকম পৈশাচিকতা আছে তা দেখিয়ে বেড়াচ্ছে। সামান্য কয়েকটা নমুনা দেওয়া যেতে পারে। শিক্ষক ছাত্রীকে, পালকপিতা কন্যাকে, এমন কি বাবা তার মেয়েকে ধর্ষণ করেছে। এছাড়াও আছে শিশু কিশোরী যাদের বয়স দুই থেকে বারো বছর। এত সব দেখেশুনেও দিল্লী কাণ্ডে প্রতিবাদ মিছিল হয়। এই ভয়ানক সামাজিক অসুখের নিরাময়ের পথ খোঁজার জন্য বিদ্বজ্জনের কোনও প্রচেষ্টা নাই।

ক্যারেক্টার বনাম কেরিয়ার :

গণধর্ষণ শব্দজোড়টি কিছু পুরাতন হলেও 'জঙ্গি পড়ুয়া' শব্দজোড়টি একেবারে হাল আমলের। দু হাজার বার সালের নভেম্বর ডিসেম্বর থেকে সংবাদপত্রে এর ব্যবহার দেখা গেল। বিদ্যায়তনের পরীক্ষা পড়াশুনা নিয়ে কখনও কখনও কিছু সংবাদ প্রকাশিত হোত। কিন্তু এবার দেখা গেল ছাত্রছাত্রী অভিভাবক একসঙ্গে কর্তৃপক্ষ, শিক্ষকদের উপর আক্রমণ। অকৃতকার্য ছাত্রছাত্রীকে পাশ করাতে হবে। এমন অদ্ভুত দাবি এই প্রথম দেখা গেল। দেখা গেল ছাত্র শিক্ষককে ঘেরাও করছে। প্রধান শিক্ষক ছাত্র অভিভাবকের হাতে লাঞ্ছিত হচ্ছেন। তার প্রকাশিত ঘটনার কারণ কেমন অদ্ভুত মনে হয়। যিনি যে ধারণাই করুন একটা বিষয় অত্যন্ত স্পষ্ট তা হলো প্রতিযোগিতার দৌড়ে ব্যর্থ হলেও তাকে এগিয়ে দিতে হবে। কেরিয়ারের লক্ষ্য এই। যেন তেন প্রকারেণ উদ্দেশ্য সাধন করতে হবে। এখানে ন্যায় অন্যায় অন্যের সুবিধা অসুবিধা, সত্য মিথ্যা নাই— চাই সফল কেরিয়ার। একে গড়ে তুলতে হলে পড়াশোনা ছাড়াও চাই স্মার্টনেস, চাই বসিং এবং নৈতিকতা ভুলে উদ্দেশ্য সাধন। সমাজ-দূষণের বীজ কিন্তু এখানেই লুকিয়ে আছে। পরাধীন ভারতের আদর্শ ছিল চরিত্র গঠন। বলা হোত মানুষকে চেনা যাবে তার চরিত্রে। বিনয় নম্রতা সত্যনিষ্ঠা ভক্তি শ্রদ্ধায় একটা মানুষের মতো মানুষ হবে। যার প্রভাবে তার কুলশীল মান উজ্জ্বল হবে। শুধু চাওয়া নয় দিতেও হবে। সহানুভূতি দয়া মায়ায় সমাজের একজন পরম সহায়ক মানুষ হবে। প্রাচীন ভারত থেকে প্রাক্‌স্বাধীন ভারতের এই ছিল আদর্শ। এসব গুণগুলো সহজাত হলেও শিক্ষার প্রভাবে এগুলি বিকশিত করতে হবে। গুরুগৃহ থেকে এই সেদিনের অর্থাৎ প্রাক্‌স্বাধীন ভারতের শিক্ষালয়ে এই শিক্ষাধারা চলে এসেছিল। যার ফলে অসংখ্য দেশপ্রেমিক পেয়েছে ভারত। যার পরিণামে এসেছে স্বাধীনতা। তারপর থেকেই বদলে গেল সমস্ত ছবি। মানুষ দৃষ্টি ফেরাল কেবল নিজের দিকে। চাইল নিজের কেরিয়ার গড়তে। দয়া মায়া বিনয় নম্রতার পরিবর্তে চাইল স্মার্ট হতে। স্মার্ট হতে গিয়ে নিজের ভাষা পোষাক পরিচ্ছদ খাওয়া চাওয়া সব বদলে ফেলল। যারাই স্মার্ট বলে পরিচিত তারা সমাজে সম্মান পেতে লাগল। স্মার্টদের সঙ্গে মিশতে গিয়ে স্বাভাবিক ভাবেই এসে পড়ল, পানীয়

আর যথেচ্ছাচার। প্রথম দিকে একে দোষের বলে মনে করল না কেউ। এমনকি অভিভাবকও ছেলে মেয়ে স্মার্ট হচ্ছে জেনে প্রশ্রয় দিতে লাগলেন। এই ধারা নেমে এল সমাজের নীচের তলা পর্যন্ত। ভয়াবহ হয়ে উঠল সামাজিক পরিবেশ।

নীতিশূন্য রাজনীতি :

স্বাধীন ভারতের সংবিধান মেনে দলতন্ত্রের সৃষ্টি হলো। নির্বাচনের মুখ্যকথা হলো দলকে ভারি করা। এখানেও সেই ন্যায় অন্যায় বোধ বিসর্জন দিয়ে লোভ আর ভয়কে হাতিয়ার করে চলল দলের শক্তি বৃদ্ধি। সমাজে যাদের মানুষ দুষ্কর্মকারী বলে এড়িয়ে চলে তারাই দল ভারি করার কাজে সহায়ক হয়ে উঠল। এই দলীয় ছাপ নিয়েই এরা দুষ্কৃতকারীর পরিবর্তে সমাজসেবী আখ্যা নিয়ে গোটা সমাজের উপর বিষময় প্রভাব ফেলল। কিছু অনুগামীকে আজ্ঞাবহ করে তুলে এক একটি ছোট ছোট দলে ছোট ছোট এলাকা নিয়ে রাজত্ব করতে শুরু করল। এরই পরিণতি গণধর্ষণ।

অন্যদিকে রাজকোষে অর্থাগমের জন্য চোলাই মদের ঢালাও লাইসেন্স বিলি করা হলো। আরও বেশি করে মানুষ মদে আসক্ত হয়ে পড়ল। ঘরে ঘরে অশান্তির আগুন জ্বলল। আরও লক্ষণীয় বেশ কয়েক বছর আগে একজন মাতাল গা ঢাকা দিয়ে চলতো। কথা বলতে হলে মুখ ফিরিয়ে অথবা মুখে চাপা দিয়ে কথা বলতো। এখন সেটা নেই। বরং ভাবটা এমন যে মদ না খায় সে মানুষ নয়।

ক্যানসার প্রতিরোধের জন্য আন্তর্জাতিক ধূমপান বিরোধ দিবস পালিত হচ্ছে। মদ নিষিদ্ধ বলে কোনও আন্তর্জাতিক দিবস হবে না। হওয়া সম্ভবও নয়। জলবায়ুর দাপটে অনেক দেশে মদ প্রয়োজন। কিন্তু ভারতে? ভারতে মদের প্রয়োজন নাই। অথচ এই মদই আমাদের সদ্বুদ্ধি লোপ করছে। কোন্‌টা করণীয় কোনটা নয় তা ভাবনার রাস্তা বন্ধ করে দিচ্ছে। এর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি যুক্ত অসামাজিক কামাচার। একা যেখানে দুর্বল, সেখানে দলবদ্ধ শক্তি অন্যায় কাজকেই প্রশ্রয় দিচ্ছে। সমধর্মী মানুষের কাছে বাহাদুরি দেখানোর লোভ সামলানো মুস্কিল হচ্ছে। পথে ঘাটে যখন তখন যেখানে সেখানে মাতালের দেখা পাওয়া যাচ্ছে। সাধারণ মানুষ তাদেরকে ভয় করে, এড়িয়ে যায়। তবু ওরা সুযোগ খোঁজে। সুযোগ পেলেই সদ্ব্যবহার করে।

> **যখন দেখা যায় বিজ্ঞাপনের ছবি থেকে ভাষা দুর্বল স্নায়ুতন্ত্রকে উত্তেজিত করে। অসাড় বুদ্ধিবৃত্তির উপর তাৎক্ষণিকে প্রলুব্ধ করে তখনই অসামাজিক কাজকর্মের উৎস মুখ খুলে যায়। আপত্তিটা এখানেই।**

দূষিত সংস্কৃতি :

খবরের কাগজ সহ যা কিছু সংবাদমাধ্যম বেশির ভাগই ব্যবসায়ীর কাছে নিজেদের বিক্রি করে দিয়েছে। পণ্যের বিজ্ঞাপন তাই এখন সব জায়গাতেই জায়গা করে নিয়েছে। সাধারণ ভাবে এতে বলার কিছু নাই। কিন্তু যখন দেখা যায় বিজ্ঞাপনের ছবি থেকে ভাষা দুর্বল স্নায়ুতন্ত্রকে উত্তেজিত করে। অসাড় বুদ্ধিবৃত্তির উপর তাৎক্ষণিকে প্রলুব্ধ করে তখনই অসামাজিক কাজকর্মের উৎস মুখ খুলে যায়। আপত্তিটা এখানেই। কিন্তু এক শ্রেণির বিদ্বজ্জন আছেন যাঁরা সমস্ত মানুষই যেন সন্ন্যাসী হয়, অন্ততপক্ষে সন্ন্যাসী হওয়া উচিত এই মত পোষণ করেন। অশালীন ছবি দেখবে, উত্তেজিত হবে না। অর্থহীন শব্দসহ উন্মাদ তৈরি করার গান মাইকে অবিরত বাজতে থাকবে, তাতে কান দিলে চলবে না— তাকি কখনও সম্ভব! একজন মাতাল বিচার বিবেচনা শূন্য, স্নায়ু তার উত্তেজিত, তার কাছে এ জাতীয় গান ও ছবি তাকে দুষ্কর্ম করার আরও বেশি সাহস যোগায়। এ থেকে নিবৃত্ত করার কোনও পথই আমাদের খোলা নেই। এখন যা সব সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয় তার মূল লক্ষ্য থাকে উত্তেজক গান বাজনার আর বলা যেতে পারে শালীনতা বিহীন উদ্দণ্ড নৃত্যের। এরই বল্গা ছেড়া পরিণতি হলো— গণধর্ষণ। দেখা গেছে শতকরা নব্বইটি ধর্ষণের ক্ষেত্রে মাতাল যুক্ত আছে। গণধর্ষণের প্রত্যেকটিতে আছে মদ ছবি গান প্রভৃতির একত্র প্রতিক্রিয়া।

আগেই বলা হয়েছে ভারতে মদ্যপান শরীর রক্ষার জন্য অপ্রয়োজন। এর কুফল সকলেরই জানা আছে। কিন্তু সরকারের বদান্যতায় হাতের কাছে এখন চট্‌জলদি আনন্দ পাওয়ার আর কি থাকতে পারে। তাই আনন্দের জন্য মদ খায়। পরে মদই মানুষের বিচার বিবেচনা সৎ অসৎ ভাবনা কেড়ে নিয়ে তাকে মাতাল করে।

পরে আরও আনন্দ পাওয়ার লোভে দুষ্কর্ম করে বসে। আজ যদি মদের ব্যবহার সীমাবদ্ধ হয়, শব্দ দূষণকারী মাইকের উন্মাদ করে তোলা গানগুলি সীমাবদ্ধ করা যায়, সিনেমা টিভির ছবিগুলি যদি সর্বতোভাবে ভারতীয় হয়ে ওঠে, আশা করা যায় তবে গণধর্ষণ থাকবে না। এমন কি অমানবিক ধর্ষণ সংখ্যাও কমে যাবে।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের
মুখপাত্র
প্রণব
পড়ুন ও পড়ান

ভি ভি আই পি হেলিকপ্টার কেনায় দালাল চক্রের হদিশ

অন্য উপায় খুঁজতেই হবে

মেজর জেনারেল কে কে গঙ্গোপাধ্যায় (অবসর প্রাপ্ত)

১৯৮৬-তে বোফর্স কামান ক্রয়ের সময় যে দালালির তথ্য উঠে এসেছিল, সে বিষয়ে অনেক তদন্ত হয়েছে। শেষ পর্যন্ত ইতালিয়ান কত্রোচি এবং হিন্দুজা ভাইদের নাম উঠে এসেছিল। কত্রোচি যে দালালির একটা বড় ভাগ পেয়েছিল সে তথ্য তদন্তে প্রমাণিতও হয়েছিল। কিন্তু কত্রোচি ভারত থেকে বিদেশে পালিয়ে যায়। তাকে ভারতের আদালতে বিচারের জন্য তোলা সম্ভব হয়নি। শেষ পর্যন্ত ইতালির আদালত তাকে ভারতে পাঠাতে সম্মত হয়নি।

বোফর্স কামান তার ক্ষমতা কারগিলের যুদ্ধে প্রমাণ করেছে। কিন্তু বোফর্স কোম্পানিকে কালো তালিকায় প্রেরণ করার জন্য ওই কোম্পানি থেকে আর কোনও কামান ভারতে আমদানি করা হয়নি। ফলে ১৫৫ মিঃমিঃ এর পার্বত্য যুদ্ধে একান্তভাবে প্রয়োজন, যা বোফর্স কোম্পানি নির্মাণ করে, সেই শ্রেণীর কামান আজও ভারতের অস্ত্র ভাণ্ডারে নেই। সংবাদে প্রকাশ (ও এফ বি) ভি আর ভি ও ওই শ্রেণীর কামান ভারতেই প্রস্তুত করতে সমর্থ হয়েছে এবং ১২৬০ কোটি টাকায় ১১৪টি কামানের বরাত পেয়েছে।

পরবর্তীকালে ভারতের প্রতিরক্ষা দপ্তর প্রতিটি প্রতিরক্ষা চুক্তির ক্ষেত্রে সততা চুক্তি সম্পাদনের ব্যবস্থা করেন। এই চুক্তি অনুসারে সরবরাহকারী সংস্থা কোনও দালাল নিযুক্ত করলে, অস্ত্র-উপকরণের চুক্তি বাতিল বলে গণ্য করা হবে।

যাঁরা বিশ্বের অস্ত্র ব্যবসায়ীদের বিষয়ে অবগত আছেন, তাঁরা জানেন, বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের অস্ত্র নির্মাণকারী এবং বিক্রেতা সংস্থা বহু অর্থ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিভিন্ন দালাল সংস্থাকে নিয়োগ করেন। কারণ যেভাবেই হোক চুক্তি সম্পাদন এবং সরবরাহ করতে পারলে নিজেদের রাষ্ট্রের পক্ষে বহু অর্থ আয় হবে এবং রাষ্ট্রীয় অর্থনীতিতে এই অর্থ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকে, বিশেষ করে বর্তমানের বিশ্বব্যাপী এই অর্থনৈতিক মন্দার পরিপ্রেক্ষিতে।

বোফর্স-এর পর জাহাজ, সাবমেরিন, বিমান, ছোট অস্ত্র ইত্যাদি কেনার প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে বিভিন্ন দালাল সংস্থার নাম উঠে এসেছে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের কালো তালিকা দীর্ঘায়ত হয়েছে, কিন্তু ভারতের সামরিক বাহিনীর তিনটি অঙ্গকেই অস্ত্র, এ্যামুনিশন ও উপকরণের অভাবে বিশেষ ভাবে চিন্তান্বিত হতে হয়েছে। প্রাক্তন সেনাধ্যক্ষ জেনারেল ভি কে সিং ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে এই বিষয়ে অবগত করিয়ে সমালোচনার মুখে পড়েছিলেন। ভারত আর্তমুভার লিমিটেডের (বি ই এম এল) মাধ্যমে নিম্নমানের টাট্রা ট্রাক্টর গ্রহণে সম্মতি প্রদানের নিমিত্ত তাঁকে ১৪ কোটি টাকা উৎকোচ দেওয়ার প্রস্তাব, যা তিনি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং

প্রতিরক্ষা মন্ত্রী এ কে অ্যান্টনি।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর নজরে তিনি এনেছিলেন। এ বিষয়েও তাঁকে কম হেনস্থা হতে হয়নি। কারগিল যুদ্ধের পর, ভারতের শহীদ জওয়ানদের মরদেহ নিজ নিজ গৃহে পাঠানোর প্রয়োজনে যেসব কফিন বিদেশ থেকে আমদানি করা হয়েছিল, তাও নাকি বাজার দরের অনেক বেশি দাম দিয়ে কেনা হয়েছিল বলে তদন্ত দাবী করা হয়েছিল। মনে রাখতে হবে হঠাৎ করে বহু সংখ্যায় কফিন ক্রয় করতে গেলে, চাহিদা বুঝে ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান দাম বাড়িয়ে মোটা লাভ করার প্রয়াস করবে এটাই স্বাভাবিক। তারাও জানতো চড়া দামে ওই ব্যয়বহুল কফিন না কিনলে মরদেহগুলিতে পচন ধরবে। এই বিষয়ে চড়া দাম না দিয়ে হয়তো গত্যন্তর ছিল না। তবুও তদন্ত হয়েছিল।

বর্তমানে সরকারের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের যাতায়াতের জন্য ১২টি উচ্চ প্রযুক্তির হেলিকপ্টার ক্রয় করার প্রয়োজন হয়। এই হেলিকপ্টারগুলি অন্ততঃ ১৮০০০ ফিট উচ্চতায় সুরক্ষার সঙ্গে উড়তে, প্রয়োজনে নামাওঠাও করতে পারবে। এই শর্তসাপেক্ষে দরপত্র চাওয়া হয়েছিল। ইতালির অগস্তা ওয়েস্টল্যান্ড কোম্পানি এই বরাত পেয়েছিল। দর ধার্য হয়েছিল ৩৫৪৬ কোটি টাকা। ভারতের

সঙ্গে ‘সততা চুক্তি’ও কোম্পানি সম্পাদন করেছিল। তিনটি হেলিকপ্টার তারা সরবরাহ করে দামের প্রায় ৪৫ শতাংশ অর্থও পেয়েছেন। এই সময় জানা যায়, ইঙ্গো-ইতালিয়ান কোম্পানি ‘অগস্তা ওয়েস্টল্যান্ড’- এর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ব্রুনো স্পাগনোলিনি ইতালিতে গ্রেপ্তার হয়েছেন, বিক্রয়মূল্যের অন্ততঃ দশ শতাংশ অর্থ চুক্তি করে তিনটি দালাল চক্রের হাতে প্রায় ৩৬২ কোটি টাকা ইউরোতে তিনি দিয়েছেন। এই অর্থের একটা বড় অংশ ভারতীয় দালালরাও পেয়েছেন। দালাল চক্রের মূল পাণ্ডা ছিলেন ‘খৃস্টান মাইকেল’ এবং ‘ওইডো হামকে’। এই অর্থ দুবাই, ইতালি এবং সুইজারল্যান্ড-এর বিভিন্ন ব্যাঙ্কের মাধ্যমে পাইয়ে দেওয়া হয়েছে। ভারতের সঙ্গে মূল চুক্তি স্বাক্ষর হওয়ার পর চুক্তি-পরবর্তী পরিষেবা দেওয়ার অঙ্গীকার পত্র রূপে দালাল চক্রের সঙ্গে চুক্তি হয়। ভারতের সংবাদ মাধ্যমে চুক্তি সম্পর্কে বিরূপ সমালোচনার তথ্য সংগ্রহ, স্থানীয় কোনও আইনের পরিবর্তন হলে তার প্রভাব কি হতে পারে, সম্ভাব্য ক্ষতি-নিরোধ, প্রযুক্তিগত সাহায্য দেওয়া ইত্যাদি বিষয়ের জন্য মাইকেলের গ্লোবাল সার্ভিসেস এফ জেড ই, ভারতের মোহালির আই ডি এস ইনফোটেক কোম্পানিকে চুক্তিগত অর্থ দেওয়া হয়েছে, যা ভারতীয় আইনে (সততা চুক্তি) শর্ত ভঙ্গের সমতুল্য। সি বি আই তদন্ত করে এই সমস্ত তথ্য পেয়েছেন।

ভারতের বিমান বাহিনীর প্রাক্তন অধ্যক্ষ এয়ার চিফ মার্শাল ত্যাগির নামও এই ভ্রষ্টাচার কাণ্ডে জড়িয়ে যায়। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, তাঁর ভাইপো-ভাইঝিদের মারফৎ টাকা পেয়ে হেলিকপ্টারের মান (কিউ-আর) তিনি নিম্নমুখী করে দেন। ১৮০০০ ফিট উচ্চতায় উড়ান ও নামা-ওঠার জায়গায় ১৫০০০ ফিট উচ্চতা ধার্য করা হয়। এয়ার চিফ মার্শাল ত্যাগি এই অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন। উচ্চতার পরিবর্তন তিনি ক্ষমতায় আসার অনেক আগেই করা হয়েছিল। তিনি শুনেছেন, ১৮০০০ ফিট উচ্চতায় উড়ান যোগ্য হেলিকপ্টার মাত্র একটি সংস্থাই নির্মাণ করে থাকে, কিন্তু মাত্র একটি দরপত্র নিয়ে এতবড় একটা চুক্তি সম্পাদন করা উচিত নয় মনে করে উড়ানের উচ্চতা ১৮০০০ ফিট থেকে কমিয়ে ১৫০০০ ফিট করা হয়েছিল। এ বিষয়ে তাঁর কিছুই করার ছিল না। বাকী

ফিনমেক্যানিকা-র সিইও গুইসেপি ওরসি।

সমস্ত বিষয় প্রতিরক্ষামন্ত্রকই চূড়ান্ত করে চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে সিবিআই তদন্ত করছে এবং প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ আরম্ভ হয়েছে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী সর্বদাই ভ্রষ্টাচারের ক্ষেত্রে কঠোর মনোভাব নিয়ে থাকেন। এক্ষেত্রেও অগস্তা ওয়েস্টল্যান্ড কোম্পানিকে (ইঙ্গো-ইতালিয়ান) কালো তালিকাভুক্ত করে চুক্তি বাতিলের এবং প্রদেয় অর্থ ফেরৎ দেওয়ার দাবী করতে চাইছেন। কিন্তু ইতালি সরকার জানিয়েছেন তাঁদের তদন্ত এখনও অসম্পূর্ণ।

কিন্তু চুক্তি বাতিলের ফল কি হবে? গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সুরক্ষার সঙ্গে দুর্গমক্ষেত্রে যাওয়ার হেলিকপ্টার থেকে ভারতীয় বিমানবাহিনী বঞ্চিত হবে। যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্বাধীনতার পর থেকে উচ্চ-প্রযুক্তির কোনও অস্ত্র উপকরণ ভারতকে দেয়নি, কিন্তু সিয়েটো, স্যান্টো চুক্তির সদস্য পাকিস্তানকে অর্থ, অস্ত্র, এ্যামুনিশন, উপকরণ সবই দিয়ে এসেছে। ফলে ভারতকে পাকিস্তানের ‘সেবার লড়াকু বিমান’ ও প্যাটন ট্যাঙ্কের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সেঞ্চুরিয়ান ট্যাঙ্ক ও বিমান এবং এল-৪০ বিমান ধ্বংসী কামান নিয়ে যুদ্ধ করতে হয়েছিল। ভারত জোট নিরপেক্ষ তৃতীয় শক্তি হিসাবে যুগোশ্লাভিয়া ও মিশরের সঙ্গে স্বতন্ত্র দাঁড়িয়ে ছিল। তা সত্ত্বেও সোভিয়েত ইউনিয়ন ভারতকে সুকোই বিমান, টি-৭০ ট্যাঙ্ক, কাঁধ থেকে প্রয়োগ করার বিমানধ্বংসী মিসাইল, রকেট ইত্যাদি দিয়ে ভারতকে প্রথম শ্রেণীর সামরিক শক্তিতে পরিণত করেছিল। তাও আবার ভারতীয় টাকায় দাম দেওয়ার সুবিধা সহ। কিন্তু এই সময় কোনও চুক্তির

পিছনেই কোন দালাল চক্রের নাম-গন্ধ কেউ কখনও শোনেনি। সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলয়ের পর ওই রাষ্ট্র নয়টি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে বিভক্ত হওয়ায় এই অস্ত্র নির্মাণ শিল্প এক প্রকার ভেঙে যায় এবং ভারতের দুর্দশা বাড়তে থাকে। কারণ বিশ্বের খোলা অস্ত্র-বাজারে দালালচক্র, কমিশন এজেন্ট এবং লাবিইস্ট ইত্যাদি অতি সাধারণ নিত্যনৈমিত্তিক ব্যবসায়িক প্রক্রিয়া।

সামরিক বাহিনীর তিন অঙ্গের প্রয়োজন মেটাতে ভারত কি ধরনের অস্ত্র উপকরণ আমদানি করছে, সামরিক বাহিনীর ক্ষেত্রে এই বিষয়টি অতি গোপনীয় বিষয়। ভারতের বৈরী কোনও রাষ্ট্রের এটা জানার কথা নয়। ওই সব রাষ্ট্র নিজেদের গোয়েন্দা বাহিনী ব্যবহার করে ওই সব তথ্য জানার প্রয়াস করে থাকে। কিন্তু খোলা বাজার থেকে অস্ত্র উপকরণ ক্রয়ের ক্ষেত্রে ওই বিষয়গুলি সর্বজনীন হয়ে যায়। সেইজন্য অস্ত্র উপকরণ আমদানির পর নিজস্ব প্রতিষ্ঠানে সেইসব অস্ত্র উপকরণের অনেক কিছুই পরিবর্তিত করা হয়। যেমন 'ও এফ বি' এবং 'ডি আর ডিও'র মতো সংস্থা। কিন্তু পরিতাপের বিষয় ওইসব প্রতিষ্ঠানের পিছনে বহু অর্থ ব্যয় করার পরও বিগত ষাট বছরে কোনও অস্ত্র উপকরণের প্রাথমিক ডিজাইন পরিকল্পনা এবং পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে নতুন অত্যাধুনিক কোনও অস্ত্র-উপকরণ সামরিক বাহিনীর হাতে তারা তুলে দিতে সমর্থ হয়নি।

যতদিন দেশের অভ্যন্তরে আধুনিক প্রযুক্তির অস্ত্র উপকরণ নির্মাণের ক্ষমতা সৃষ্টি করা সম্ভব না হয়, ততদিন এই দালাল চক্রের সমস্যা চলতেই থাকবে। একদিকে 'সততাচুক্তি' মারফৎ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের উপর চাপ সৃষ্টি করে রাখতেই হবে। অন্যদিকে নিজের ঘর সামলানোর দিকে বিশেষ প্রয়াস করতেই হবে। রাজনৈতিক নেতৃত্বের সহায়তায়, আমলাতন্ত্রের সাহায্যে অথবা সামরিক বাহিনীর কর্মরত অথবা অবসরপ্রাপ্ত সদস্যদের অর্থ দিয়ে ব্যবহার করার কোনও তথ্য প্রকাশ পেলে সেইসব দেশী দালালের কঠোরতম শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। শুধুমাত্র 'ডিফেন্স প্রকিওরমেন্ট প্রসিডিওর' ইত্যাদি পুস্তিকা প্রকাশ করে, যার ছত্রে ছত্রে একাধিক ফাঁক ফোকর থাকার সম্ভাবনা রয়েছে, এই দেশী-বিদেশী দালালদের নিরস্ত করা যাবে না। সামরিক বাহিনীর যে অঙ্গের অস্ত্র-উপকরণ আমদানি করার প্রয়োজন এবং যারা যুদ্ধক্ষেত্রে ওই অস্ত্র উপকরণ ব্যবহার করবেন, আমদানির ক্ষেত্রে তাদের-ই বিশেষ ভূমিকা থাকা উচিত।

অবশ্যই প্রতিরক্ষামন্ত্রক এবং প্রতিরক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার মাধ্যমে প্রতিটি চুক্তি বাস্তবায়িত হবে। তৃতীয় কোনও পক্ষকেই নাকগলানোর সুযোগ দেওয়া যাবে না। তা সত্ত্বেও যদি কোনও দালাল চক্রের নাম সংবাদে উঠে আসে, যতক্ষণ অস্ত্র-উপকরণের মান অথবা দামের কোনও তারতম্য না ঘটে, তাহলে চুক্তি বাতিলের প্রশ্ন না তোলাই ভাল। যুদ্ধক্ষেত্রে খালি হাতে যুদ্ধজয় করা সম্ভব নয়। ভারত যখন যুদ্ধ করতে বাধ্য হবে, ''নিশ্চিত কর জিৎ আপনি'' সিদ্ধান্ত নিয়েই অগ্রসর হবে।

'ফিসচুলা, পাইলস্ থেকে বিনা রক্তপাতে চিরমুক্তি'

পায়ুদ্বারের ভেতরে বা বাইরের নানা শিরা উপশিরায় জ্বালাময়, যন্ত্রণাদায়ক পরিস্থিতিই হলো পাইলস্।

পায়ুদ্বারের পাশে হওয়া গর্ত থেকে পুঁজ, গ্যাস, রক্ত বা বায়ু ইত্যাদি নির্গত হলে তা হলো ফিসচুলা। এই সমস্ত রোগে রোগীরা এর ওর কথায় টোটকা ব্যবহার করেন। তাতে যন্ত্রণা বেড়েই চলে। ডাক্তারের কাছে গেলে উপদেশ দেন অপারেশনের। পুনঃ পুনঃ অপারেশনেও সারে না। কখনও কখনও সৃষ্টি হয় নতুন সমস্যা, অথচ আমাদের আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা পদ্ধতি বিনা অপারেশনে যন্ত্রণাহীন চিকিৎসার পথ খুঁজে পেয়েছে অনেককাল আগেই। আয়ুর্বেদে ক্ষারসূত্র ও কেমিক্যাল কর্টারির সুনিপুন মিশ্রণে **জীবক আয়ুর্বেদিক স্পেশালিটি সেন্টার** তৈরি করেছে এক অভিনব চিকিৎসা পদ্ধতি। যার সফলতম প্রয়োগে পাইলস এবং ফিসচুলার যন্ত্রণাহীন কার্যকরী চিকিৎসা করা সম্ভব। এই জাতীয় চিকিৎসায় নামমাত্র কাটা ছেঁড়ার প্রয়োজন হয়। তাই রোগী চিকিৎসার পর পায়ে হেঁটে বাড়ী ফিরতে পারেন।

না এটা কোন হাতুড়ে অস্ত্রোপচার নয়, বিগত দশ বছর ধরে যে পদ্ধতিতে এখানে শত শত রোগী চিরতরে সুস্থ হয়েছেন সেই পদ্ধতি জাপানে তোয়ামা মেডিক্যাল কলেজ এবং নেপালে ত্রিভুবন ইউনিভার্সিটির চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের দ্বারা পরীক্ষিত এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা দ্বারা (WHO) স্বীকৃত দিল্লীর AIIMS ও চণ্ডীগড়ের P.G.I. তেও এই পদ্ধতি অনুসরণ করা হচ্ছে।

কি কি চিকিৎসা হয় এই পদ্ধতিতে?

প্রোলাপ্স পাইলস্, ফিসচুলা, ব্লিডিং পাইলস, পাইলোনিডাল সাইনাস, রেক্টোভ্যাজাইনাল ফিসচুলা, ফিসার সবকিছুরই চিরতরে মুক্তি ঘটে।

জীবক আয়ুর্বেদিক স্পেশালিটি সেন্টার

হাকিমপাড়া, হরেন মুখার্জী রোড, G.T.S. ক্লাবের নিকটে জর্জ ইনস্টিটিউট বিল্ডিং, শিলিগুড়ি

ডাঃ এস কর, মোবাইল নং-9434877734

—ঃ এখানে রোগীদের দেখার সময় ঃ—

সোমবার থেকে শুক্রবার ঃ সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১২.৩০টা পর্যন্ত এবং বিকেল ৫ টা থেকে ৮টা পর্যন্ত।
ও শনিবার ঃ বিকেল ৫ টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত।

আমাদের প্রতিরক্ষা কি দুর্নীতির চোরাবালির উপরে দাঁড়িয়ে ?

সমর পণ্ডিত

সংবাদ মাধ্যমের লোকজনের সামনে অভ্যস্ত ভঙ্গিতে হাত নাড়িয়ে প্রতিরক্ষামন্ত্রী এ কে অ্যান্টনি বলেছেন, 'আমাদের হাত পরিষ্কার। কিছুই লুকোবার নেই আমাদের।'

দিনটা ১৮ ফেব্রুয়ারি। ওই সময়েই সামনে চলে এসেছে হেলিকপ্টার কেনা নিয়ে গোলমাল। মন্ত্রিমশাই তাঁর মন্ত্রকের সপক্ষে কথা বলেছেন। এর দুটো দিক রয়েছে— ১. ফৌজের গোপনীয়তার খবর প্রকাশ্যে আসুক— এটা চান না এবং ২. কোনওরকম গোলমাল ঘটলেও তার সমাধান প্রশাসনিক পদ্ধতিতে সম্ভব।

আমাদের ফৌজকে বিদেশ থেকে সামরিক সরঞ্জাম কিনতে হয়। অনেক টাকা সেজন্যে ব্যয় হয়। এই কেনাবেচার সঙ্গে কিছু নেপো বা উটকো লোক নানারকম সুবিধে নেয়; সেইসঙ্গে কেনাবেচার চুক্তির মধ্যে থাকা ব্যবসায়ীরা। ৩,৫৪৬ কোটি টাকার হেলিকপ্টার কেনা হয় ইতালির অস্ত্র-উৎপাদক সংস্থার কাছে। ৩৫০ কোটি টাকা চুক্তির যোগসূত্র গড়ার জন্যে ইতালির সংস্থা পায়। এই বাণিজ্যিক কর্মের জন্যে ঘুষ দেওয়ার ব্যাপারও ঘটে। সেই অভিযোগে ইতালির অস্ত্র ব্যবসায়ী সংস্থার চিফ একজিকিউটিভ অফিসার গ্রেপ্তার হন। প্রতিরক্ষামন্ত্রক ব্যাপারটা জানার পর তদন্তের নির্দেশ দেয়। ভারতে সবথেকে বেশি অস্ত্র সরবরাহ করছে কয়েক বছর ধরে ইতালি। সে দেশের যে সংস্থাটি ব্যবসা করছে সেটি বিশ্বের বড় অস্ত্র উৎপাদক সংস্থার মধ্যে অষ্টম। ওই সংস্থার চিফ একজিকিউটিভ অফিসার দালালের ভূমিকা নিয়েছিলেন। ২০০৭ সালে ওই সংস্থা ভারতে অস্ত্র সরবরাহের ব্যবসায় ঢোকে। পরের বছর রাজধানীতে ঝকঝকে অফিস করে। ভারতে সারাবছরে কি পরিমাণ অস্ত্র সরবরাহ করা হবে তার লক্ষ্যমাত্রা স্থির হয়। পাঁচ বছরের

কালো তালিকাভুক্ত সংস্থা

সেই ২০০৫ সাল থেকে প্রতিরক্ষামন্ত্রক বিশ্বের কয়েকটি অস্ত্র নির্মাণকারী সংস্থাকে দশ বছরের জন্য ভারতে ব্যবসা করতে পারবে না বলে নির্দেশ জারি করেছে।

অস্ত্র নির্মাণকারী সংস্থা	দেশ এবং কি তৈরি করে	কালো তালিকাভুক্ত হওয়ার কারণ	সেনাবাহিনীর উপর তার প্রভাব
সিঙ্গাপুর টেকনোলজিস কিনেটিকস	**সিঙ্গাপুর** হাউইৎজার, ওয়েপন্স	মার্চ ২০০৯ সুদীপ্ত ঘোষ চেয়ারম্যান অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরির ঘুষের মামলা	গোলন্দাজ বাহিনীর আধুনিকীকরণের জন্য ২২০০টি কামান কিনতে বরাদ্দ ২২০০ কোটি টাকা ক্ষতি
রেহিনমেটল (Rheinmetall) এয়ার ডিফেন্স	সুইজারল্যান্ড অ্যান্টি এয়ারক্র্যাফট গান্‌স	ঘুষের মামলা	১১০০টি অ্যান্টি এয়ারক্রাফট বন্দুক (কামান) কিনতে দেরী হওয়ার জন্য দাম দিতে হয়েছে ১১০০০ কোটি টাকা
ইস্রায়েল মিলিটারি ইন্ডাস্ট্রিস	**ইস্রায়েল** ইনফেনট্রি ওয়েপনস্‌	ঘুষের মামলা	অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরি বোর্ডের নালন্দা ফ্যাক্টরিতে কাজ হয়নি
ডেনেল (Denel)	**সাউথ আফ্রিকা** হাউইৎজার, আর্মাড ভিকেলস্‌, ইনফেনট্রি ওয়েপনস্‌	২০০৫-এ ঘুষ কেলেঙ্কারি	চার ধরনের আধুনিক ১৫৫ মিমি বোফর্স টাইপ হাউউইৎজার-এর ব্যাপারে সেনার খোঁজখবর নিতে দেরী।

ব্যবসা পরিকল্পনা তৈরি হয়। ওইভাবে ভারতে অস্ত্র ব্যবসার ক্ষেত্রে প্রথম জায়গাটা নেয় ইতালির সংস্থা। একেবারে নিচে, বারো নম্বরে যারা ছিল, তারা কীভাবে চলে এলো একেবারে প্রথমে?

প্রথমে ইতালি ভারতে সরবরাহ করত শুধু কিছু র‍্যাডার, টর্পেডো ও যুদ্ধজাহাজ। ভারতের প্রয়োজনীয় ৮০ শতাংশ সামরিক সরঞ্জাম আসত রাশিয়া থেকে। ২০০৭ থেকে ২০১১ সালের মধ্যে ৫৫ হাজার কোটি টাকার অস্ত্র কেনা হয়েছে। ইতালির ব্যবসায়ীরা চমৎকার কৌশলে ঢুকে পড়েছে ভারতে অস্ত্র সরবরাহের ক্ষেত্রে। ভারতে তারা ভালো বাজার দেখতে পেয়েছিল। ভারতের সঙ্গে শিল্পগত দিক থেকে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার কথা বলা হলেও তার কিছুই হয়নি।

ক্রিশ্চান মাইকেল হলেন লন্ডনের এক বিখ্যাত অস্ত্র ব্যবসায়ীর পুত্র। লন্ডনে ব্যবসাক্ষেত্রে ছিল। মাইকেলের ঘন ঘন ভারতে আসা-যাওয়া ছিল। ব্যবসার তাগিদে তিনি অনেকরকম যোগাযোগ গড়ে তোলেন বিমানবাহিনীর লোকজনের সঙ্গে। তিনি অসৎ ভারতীয় সরকারি কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রেখেছেন ব্যবসার স্বার্থে।

এইভাবে ফৌজের গোপন তথ্য পৌঁছে গেছে ঠিকেদার অর্থাৎ অস্ত্র ব্যবসায়ীদের কাছে। অর্থাৎ লেনদেনে তিনজন ভারতীয়ের নাম উঠে এসেছে দালাল হিসেবে। এরা হলো 'ত্যাগী' ভাই। পদবী 'ত্যাগী' হলেও এরা অঙ্ক কষা অর্থগৃধ্নু। দেশের স্বার্থ বিপন্ন করে এরা নিজেদের আখের গোছায়। এই তিন ত্যাগী ভাইদের সঙ্গে রাজনীতিক মহল, আমলামহল, ব্যবসায়ীগোষ্ঠী, সামাজিক গোষ্ঠীর ভালো যোগাযোগ। বড়ভাই রাজীব ত্যাগী, পাশকরা ডাক্তার। কিন্তু কখনও চিকিৎসাকার্যে থাকেনি। ডাক নাম ভরসা। ব্যবসার ছক তৈরির কাজে দক্ষ। সে অমিতাভ বচ্চনের প্রচারপ্রমুখ ছিল ১৯৮৪ সালে ভোটের সময়। তার সঙ্গে রাজীব গান্ধী ও অমিতাভ বচ্চনের সুসম্পর্ক ছিল। পরের ভাই ধুলি, সঞ্জীব ত্যাগী। আগে বিমানবাহিনীর অফিসার ছিল। প্রতিরক্ষা ব্যবসার সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিল।

বিমানবাহিনীর প্রধান এস পি ত্যাগী ছিলেন তাদের নিকট আত্মীয়। বিমানবাহিনীর প্রাক্তন প্রধান যখন কর্মরত ছিলেন তখন এই ত্যাগীরা যোগাযোগ রেখে নিজেদের ছক তৈরি করে নেয়। ঘুষের আদান-প্রদান ঘটেছে বহু কোটি টাকার। টাকা চলে গেছে নানান কৌশলে কয়েকটি কোম্পানির মাধ্যমে। অপরাধচক্র অস্ত্র-ব্যবসা পাকা করার জন্যে পুরানো পদ্ধতিতে সুরা-নারী-অর্থ যোগান দিয়েছে বিশেষ মন্ত্রকে। এই গোপন ব্যবসাচক্রের কথা ফাঁস করেন দক্ষিণ আফ্রিকার এক প্রাক্তন সাংসদ, তিনি লড়াই শুরু করেন দুর্নীতির বিরুদ্ধে। ২০১১ সালে তাঁর বই বেরোয় 'দি স্যাডো ওয়ার্ল্ড'। তাতে পৃথিবীর অস্ত্র ব্যবসার কালো ছবি তুলে ধরা হয়। নাম না করে বলা হয় ভারতের এক ফৌজি প্রধানের ঘরে কোনও অস্ত্র উৎপাদক সংস্থার প্রতিনিধি প্রবেশ অধিকার পেত না এক বোতল ব্লু লেবেল মদ না দিলে। দুর্নীতিতে ভরে গিয়েছিল সমস্ত ফৌজি কেনাবেচা। যা থামতে চায়নি কোনও সময়েই। এরকমভাবে ভারতে ঢুকেছে নিম্নমানের অস্ত্র। আর এক শ্রেণীর মানুষ টাকা পেয়েছে কেনাবেচার সূত্রে। এসব কেলেঙ্কারী দেখে এক ক্রুদ্ধ বিরোধী নেতা বলেন, 'আজ হেলিকপ্টার দুর্নীতি, কাল হবে জাহাজ নিয়ে, পরশু সাবমেরিন নিয়ে।' আমরা দেশবাসীরা সব দেখেশুনে ভাবি কীরকম বিপন্ন আমাদের নিরাপত্তা, আমাদের প্রতিরক্ষার কাঠামো!

Ori Plast

P.V.C. Threaded Pipes. For deep Tubewell & general sanitation. Substitutes to conventionnal G.I. Pipes

Authrorised Distributor :

NATIONAL PIPE & SANITERY STORES

54, N. S. Road. Kolkata-700001. Ph. : 2210-5831, 2210-5833
3, Jadu Nath Dey Road, Kolkata-12, Ph. 2215-6804, Fax : 2212-2803

PARTHA SARATHI CERAMICS

4, College St. Kalkata-700012. Ph. :2241-6413/5986

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৭০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

চিঠিপত্র

এক সন্ন্যাসিনীর করুণ আবেদন

সোনিয়া কংগ্রেসের দরবারী মহাসচিব দিগ্বিজয় সিংহ 'ভগবা আতঙ্কবাদ'-এর মিথ্যা রটনা শুরু করায় ইউপিএ সরকার তা প্রমাণ করার জন্য ষড়যন্ত্র রচনা করেছে। আতঙ্কবাদ বিরোধী বাহিনী (এ. টি. এস) সরকারের অঙ্গুলিহেলনে সমঝোতা এক্সপ্রেস বিস্ফোরণ, মালেগাঁও বিস্ফোরণ ও মক্কা মসজিদে বোমাবাজি মামলায় মিথ্যা কাহিনী ও মিথ্যা সাক্ষী-প্রমাণ তৈরি করে কয়েকজন হিন্দুকে গ্রেপ্তার করেছে। এদের মধ্যে স্বামী অসীমানন্দ ও সাধ্বী প্রজ্ঞা সিংহ উল্লেখযোগ্য। পাঁচ বছরেও এদের মধ্যে কারুর বিরুদ্ধে নিশ্চিত প্রমাণ পেশ করা হয়নি, তবু বিচারাধীন বন্দী তৈরি করে প্রতারিত করা হচ্ছে। কারণ ভগবা আতঙ্কবাদকে প্রমাণ করার জন্য গৈরিক বসনধারী কিছু ব্যক্তিকে সামনে আনা প্রয়োজন। মালেগাঁও বিস্ফোরণের সঙ্গে সন্দেহে গ্রেপ্তার সাধ্বী প্রজ্ঞা এই সময় ভয়ানক অসুস্থ অবস্থায় বিচারপতি মহাশয়কে যে মর্মস্পর্শী পত্র লিখেছেন তা এখানে দেওয়া হলো, পুরো বিষয় পাঠকের অবগতির জন্য। —সম্পাদক

মাননীয় বিচারপতি মহোদয়, উচ্চ ন্যায়ালয়, মুম্বই (মরারাষ্ট্র) দ্বারা-কারাধ্যক্ষ, সেন্ট্রাল জেল, ভোপাল, বিষয়-স্বাস্থ্য সম্পর্কিত।

মহাশয়, আমি সাধ্বী প্রজ্ঞা সিংহ ঠাকুর মালেগাঁও বিস্ফোরণ মামলায় (২০০৮) বিচারাধীন কয়েদি এবং এখন মধ্যপ্রদেশের ভোপালস্থিত কেন্দ্রীয় কারাগারে আছি। আজ ১৬ জানুয়ারি ২০১৩, আপনার প্রেরিত এক ভদ্রলোক আমাকে আপনার একটি আদেশনামা দেখান যাতে আপনি আমার চিকিৎসার জন্য যোগ্য স্থান চয়ন করে নিতে বলেছেন। মহাশয়, আমার স্বাস্থ্যের বিষয়ে আপনি সহৃদয়তার সঙ্গে চিন্তা করেছেন, তারজন্য খুবই কৃতজ্ঞ। আপনার আদেশেই আমার এই সাহস হলো যে, আমি আমার মনের অবস্থা আপনার কাছে ব্যক্ত করি। আমার মনে হচ্ছে আপনি আমার শারীরিক ও মানসিক স্থিতি এবং বিবশতা ভালভাবে বুঝতে পারবেন। সেজন্য আমি আপনার নিকট আমার কথা সংক্ষেপে রাখছি :

□ আমি বাল্যকাল থেকেই সত্যনিষ্ঠ, কর্তব্যনিষ্ঠ, সিদ্ধান্তবাদী ও দেশভক্ত। আমার বাবা আমাকে এই সংস্কারে তৈরি করেছেন। আমি একজন সামাজিক কার্যকর্তা এবং দেশের একজন সম্ভ্রান্ত নাগরিক। গত জানুয়ারি ২০০৭ থেকে সন্ন্যাসিনী।

□ অক্টোবর ২০০৮, সুরাট থেকে এ টি এস ইন্সপেক্টর সাওন্তের ফোনে আমাকে বলা হয় যে, আমি যেন তাকে আইনী সহায়তার জন্য সুরাট আসি, একটি মোটরবাইকের বিষয়ে জিজ্ঞাস্য আছে। আমি আইনকে সহযোগিতার জন্য ও আমার কর্তব্য পালনের জন্য ১০ অক্টোবর সকালে সুরাট পৌঁছই।

□ ইনস্পেক্টর সাওন্ত তার বড় সাহেবের সমক্ষে হাজির করানোর কথা বলে ১৬ অক্টোবর রাত্রিতে আমাকে মুম্বই আনেন। মুম্বায়ের কালা পুলিশ চৌকীতে ১৩ দিন পর্যন্ত আমাকে বে-আইনীভাবে আটকে রাখে ও ভয়ানক শারীরিক, মানসিক অত্যাচার ও অশ্লীল ব্যবহার করে। এর ফলে ফুসফুসের ঝিল্লি ফেটে যায়, তার প্রমাণপত্র এই হাসপাতলে আছে। আপনার আদেশে আমি প্রমাণপত্র দেখাতে পারি।

□ আবার ওখান থেকে আমাকে নাসিক নিয়ে যাওয়া হয় এবং ১৩ দিন পর আমাকে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা দেখানো হয়। এতদিন আমি কোনও খাদ্যগ্রহণ করিনি এবং লাগাতার অত্যাচার ও মুখ বেঁধে রাখার ফলে আমার শোচনীয় অবস্থা শুরু হয়।

□ এর মধ্যে অজ্ঞান অবস্থায় আমার গৈরিকবস্ত্র খুলে নিয়ে সালোয়ার-কামিজ পরানো হয়েছে।

□ আদালতের বিনা অনুমতিতে বে-আইনীভাবে আমার নার্কোপলিগ্রাফি ও ব্রেন ম্যাপিং করা হয়েছে। গ্রেপ্তারের পর আবার দ্বিতীয়বার এইসব পরীক্ষা করা হয়েছে।

□ বিচারপতি মহাশয়, এতো অমানুষিক অত্যাচার করার ফলে মেরুদণ্ডের ব্যথা ও কষ্ট শুরু হওয়ার জন্য আমি চলতে, উঠতে ও বসতে পারছি না। এদের (এ টি এস) অত্যাচারে আমি মানসিকভাবে খুবই পরিশ্রান্ত। এখন আমার সহ্যশক্তিও কমে গেছে।

□ মার্চ ২০১২ থেকে এখন পর্যন্ত আমি মধ্যপ্রদেশের ভোপাল জেলে বন্দী আছি।

□ মহাশয়, এখন আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, সন্ন্যাসী জীবনের এই শরীরের সমস্ত রোগ-ব্যাধির জন্য যতদিন চলে যোগ-প্রাণায়াম চালিয়ে যাব এবং জেলে থাকার জন্য অন্য কোনও চিকিৎসা করাবো না। মহাশয়, আমি এই সিদ্ধান্ত স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিনি। জেলবন্দী জীবনে ভয়ানক অত্যাচারের ফলস্বরূপ প্রচণ্ড মানসিক চাপে শরীরের উপর বিপরীত প্রভাব পড়তে থাকায় আমি এই সিদ্ধান্ত নিজেই নিয়েছি। আপনি এটাকে অন্যভাবে না নিয়ে আমার মনঃস্থিতি ও পরিস্থিতি বুঝবার চেষ্টা করুন। মহাশয়, আমি একজন সন্ন্যাসিনী। আমরা ত্যাগময় সংযমী জীবন যাপন করি। ভিন্ন প্রকৃতি ও ভিন্ন পরিবেশেও এটা সম্ভব হয়। আমার প্রকৃতি, দিনচর্যা, মর্যাদা, আমার জীবনমূল্যের বিপরীত পরিবেশে আমাকে ৫ বছর ধরে অকারণ জেলে বন্দী রাখা হয়েছে। এই প্রতারণাপূর্ণ অমানবিক পরিবেশে এক সন্ন্যাসীর সংবেদনশীল জীবন অসম্ভব। তবুও এসব সহ্য করে আমার ঠাকুর (ঈশ্বর)-এর স্মরণ-মননে নিজেকে সীমিত করে রেখেছি।

□ মহাশয়, আপনার নিকট অনুরোধ আমার ও ভারতীয় সংস্কৃতিতে এক সন্ন্যাসীর জীবন পদ্ধতি ও তার বিপরীত দুষ্পরিণাম অনুভব করবেন। আমার সিদ্ধান্তকে উচিত মনে করে আমার আবেদনে মনোযোগ দেবেন। যদি আমার জন্য আইনের অন্তর্গত জামিনের বিকল্প ব্যবস্থা থাকে তো আপনি কৃপা করে আপনার বিবেকীয় মানদণ্ডে আমাকে জামিন দেওয়ার ব্যবস্থা করুন।

□ আমার বক্তব্যের প্রতিটি বিষয়ের লিখিত প্রমাণ আছে। যদি আপনার আদেশ হয়, তবে আমি আপনার সমক্ষে সমস্ত কাগজপত্র পেশ করতে পারি। আমি আইনের ধারা জানি না। শুধু এইটুকু জানি আমি কোনও অপরাধ করিনি। আমি সব সময় রাষ্ট্রভক্তিপূর্ণ ও সংবিধানের নিয়মানুসারে জীবনযাপন করেছি ও এখনও করছি। আজ পর্যন্ত আমার কোনও অপরাধের রেকর্ড নেই। আমাকে মুম্বই এ টি এস চক্রান্ত করে ফাঁসিয়েছে।

নিবেদক—
প্রজ্ঞা সিংহ

(উৎস : পাঞ্চজন্য ১০ ফেব্রুয়ারি, ২০১৩)

হোলি-দোল-বসন্তোৎসব

সংকর্ষণ মাইতি

বসন্তকালে হিন্দুদের কয়েকটি প্রধান উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। হোলি বা দোল উৎসব, শিবরাত্রি, বাসন্তী পুজো, গাজন ও চড়ক ইত্যাদি। আবার কখনও কখনও সরস্বতী পুজো বসন্তকালেও অনুষ্ঠিতও হয়। যেমন, ১৪১৯ সালে সরস্বতী পুজো মাঘের পরিবর্তে ফাল্গুনে অনুষ্ঠিত। কিন্তু কোনও চিহ্নিত ঋতুর উৎসব আবহাওয়ার বিরূপতার কারণে পিছিয়ে নিয়ে গিয়ে অনুষ্ঠিত করা যায় না। কারণ, শাস্ত্রবেত্তা পণ্ডিতগণ অনেক ভেবেচিন্তে ঋতু অনুযায়ী পুজো-পার্বণ- উৎসব-এর বিধান দিয়েছেন। ধরা যাক, রথযাত্রা, প্রথম বর্ষণ আষাঢ় মাসে। ওই মাসে রথযাত্রা। আসলে জীবন জীবিকার প্রাথমিক পর্ব হলো কৃষি। এবং অন্যান্য পর্বগুলির সূচনা, যাতে রথের চলার মতো মসৃণভাবে কাজকর্ম এগোয় তা রথযাত্রার মাধ্যমে বুঝিয়ে দেওয়া। ঋতুর মহিমাকে তো অস্বীকার করা যায় না। আরও আছে। ফাল্গুনে দোল উৎসব। দোল উৎসবের কথা বৈশাখেও রয়েছে। কিন্তু ফাল্গুনে বসন্তকালে চিহ্নিত দোলউৎসব। 'মাঘ মাসে শ্রীপঞ্চমী ছেলের হাতে খড়ি, ফাল্গুন মাসে দোলযাত্রা ফাগ ছড়াছড়ি।' ফাল্গুন মাস তথা বসন্তকালে দোল উৎসবের তাৎপর্য রয়েছে। সাংস্কৃতিক দিক যেমন আছে তেমন শারীরিক দিকটি নিয়েও গুরুত্বও রয়েছে (Biological Significance)। কাজে কাজেই আমাদের উৎসব ও পার্বণগুলি অনুষ্ঠিত হয় ঋতুকে আবর্তন করেই। হোলি বা দোল উৎসব বসন্তঋতুতে আবর্তন করেই অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

ফাল্গুন মাস আসা মানে ঋতুরাজ বসন্তের আগমন। আগমন বার্তা জানান দেয় পলাশ-পারুল, কোকিল-কুহরণ। বসন্তের প্রকাশ বনে বনে— অনুভব মানুষের মনে প্রাণে। 'ওরে আয়রে তবে, মাতরে সবে আনন্দে, আজ নবীন প্রাণের বসন্তে।' বসন্তের আনন্দ বেশি বেশি করে অনুভূত হয় হোলি বা দোল উৎসবের মাধ্যমে। হোলি শব্দটি এসেছে পুরাণ কাহিনী থেকে।

দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু নিজেকে ভগবান বলে প্রচার করতেন। বালকপুত্র প্রহ্লাদ মানতে চায়নি। বিষ্ণুই হলেন তার কাছে ভগবান। ক্রুদ্ধ হন হিরণ্যকশিপু। প্রহ্লাদকে মারার জন্য কখনও হাতির পায়ে কখনও পাহাড়ের ওপর থেকে ফেলে দেওয়া হয়। প্রহ্লাদ অক্ষত। শেষে বরপ্রাপ্তা ভগিনী হোলিকাকে পাঠানো হয় প্রহ্লাদকে মারতে। হোলিকা প্রহ্লাদকে খুব আদর করে কোলে নিয়ে অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করল। আগুন নিভলে দেখা গেল, হোলিকা ভস্ম হয়ে গেছে, প্রহ্লাদ অক্ষত শরীরে আগুন থেকে বেরিয়ে আসে। এই ঘটনা স্মরণ করে পালিত হয় 'হোলিকাদহন' বা হোলি। প্রাচীনকালের হোলিকানাশ উৎসবটি থেকে হোলিকা উৎসব বা হোলি উৎসব এসেছে বলে অনেকে মনে করেন। হোলিকা নাম্নী অমঙ্গল বা অশুভ শক্তিকে নাশ করা— এই ধারণা নিয়ে আনুষ্ঠানিক উৎসবে মেতে ওঠা। পশ্চিম ভারতে হোলির আগের দিন ঘুটে সাজিয়ে আগুন দেওয়া হয়, চাঁচর উৎসব হিসেবে।

আরেকটি পুরাণ-কাহিনী রয়েছে। হুলি নামে এক অসুরকন্যা বিষ্ণুর তপস্যা করে দুটি প্রার্থনা জানায়। এক— পুত্রলাভ। সেই পুত্রের রক্ত মাটিতে পড়লে তার মতো

আরও পুত্র যেন জন্মায়। দুই— মাতা ও পুত্র একবস্ত্রে আচ্ছাদিত হয়ে অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করলে যেন পুড়ে না যায়। বিষ্ণু বললেন— 'তথাস্তু।'

সময়মতো হুলির মেড়ামুখো একটি পুত্র হয়। এই পুত্রই হলো মেন্টাসুর বা মেড়াসুর। মেড়াসুর বড় হয়ে প্রতিদিন গোপীনীদের একটি শিশুকে গিলে খায়। বিষ্ণু দ্বাপরে কৃষ্ণরূপে এসেছেন। গোপিনীরা কৃষ্ণের শরণাপন্ন। কৃষ্ণ ব্যাপারটা দেখে একটা উপায় বের করলেন। ঘরে ঘুটের আগুন জ্বালাতে হবে। গোপিনীদের নির্দেশ দিলেন প্রচুর আবির রাখতে হবে। মেড়াসুরের গায়ে রক্ত ঝরতে দেখলেই তার গায়ে আবির নিক্ষেপ করতে হবে। এবার কৃষ্ণ তক্কে তক্কে রইলেন। আর নিজেই গোপিনীর শিশুরূপ ধারণ করলেন। মেড়াসুর এসেছে যে ঘরে শিশুকৃষ্ণও এসেছেন সেই ঘরে মেড়াসুরের খাদ্য হিসেবে। শিশুটিকে দেখে হাঁ করে তাকে গিলতে গেলে শিশুকৃষ্ণ বিরাট আকার ধারণ করে মেড়াসুরকে নিয়ে জ্বলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করলেন। মেড়াসুর মায়ের শরণাপন্ন। মা হুলি পুত্রের এই দশা দেখে পুত্রকে কোলে নিয়ে বস্ত্রাবৃত হলেন। দৃশ্যটি দেখে কৃষ্ণ এক ঝটকায় উভয়ের গায়ে জড়ানো বস্ত্রটি টেনে বাইরে ছুঁড়ে দিলেন। এবার মা হুলি অসহায়। এদিকে মা ও পুত্রের গায়ের ঝরা রক্ত মাটিতে পড়লেই আরও পুত্র জন্মাবে। সেই আশায় হুলি। এদিকে কৃষ্ণ গোপিনীদের নির্দেশ দিলেন, 'মেড়াসুরের গায়ের রক্তে প্রচুর আবির ছুঁড়ে দাও তোমরা।' গোপিনীরা তাই করলেন। মেড়াসুর এবং তার মা হুলি আগুনে পুড়ে মারা গেলে কৃষ্ণ আগুন থেকে অক্ষত দেহে বেরিয়ে এলেন। ভোরবেলায় গোপিনীরা কৃষ্ণকে দোলনায় বসিয়ে আবির মাখিয়ে দোলা দিতে লাগলেন। কারণ, আর তাঁদের পুত্রদের মেড়াসুর খেতে পারবে না।

এই ঘটনা স্মরণ করে আমাদের দেশে দোলের আগের দিন শুক্লা চতুর্দশীতে বহ্ন্যুৎসব পালন করা হয়। মাঠে বা ফাঁকা জায়গায় গাছের ডালপালা ভেঙে মাটিতে পুঁতে তার ওপর খড় এবং অন্যান্য দাহ্যবস্তু দিয়ে বহ্ন্যুৎসবের আয়োজন করা হয়। কোথাও রাধা কৃষ্ণের পুজোর পর আবার কোথাও শালগ্রাম শিলার পুজোর পর ওই খড়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। আগে জীবন্ত মেড়াকে আগুনে নিক্ষেপ করা হোত। এখন নৃশংস প্রথাটি বন্ধ, মেড়ার বদলে খড়ের তৈরি মেড়া, মানুষের প্রতিমূর্তি তৈরি করে নিক্ষেপ করা হয়। একে মেড়া পোড়া বা বুড়ির ঘর পোড়া অনুষ্ঠান বলে। কোথাও আবার এই বহ্ন্যুৎসবকে (মেড়াপোড়া) চাঁচর অনুষ্ঠানও বলে। পাঁজিতেও বহ্ন্যুৎসবকে চাঁচর বলে উল্লেখ করা হয়েছে। (বেণীমাধব শীলের ফুল পঞ্জিকা), চাঁচর 'চর্চারি' শব্দের অপভ্রংশ। চর্চারি শব্দের অর্থ উৎসবে হর্ষধ্বনি। পুরাণ কাহিনী স্মরণ করে মেন্টাসুর বা মেড়াসুরের প্রতিকৃতি আগুনে পুড়িয়ে আমাদের আনন্দ প্রকাশ করা।

আরেকটা ছোট্ট কাহিনী আছে। এটা বাচ্চাদের। ধুন্ধি রাক্ষসী ছোট ছোট বাচ্চাদের খুব বিরক্ত করত। শেষে বাচ্চারা ফাঁদে ফেলে ওই ধুন্ধি রাক্ষসীকে হোলির দিন তাড়িয়ে দেয়। সেই কাহিনী স্মরণ করে হোলিকা দহনের দিন ছোট ছোট বাচ্চারা ধুন্ধি রাক্ষসীর প্রতিকৃতি বানিয়ে আগুনে ফেলে।

মেন্টাসুরকে নিয়ে আরেকটি কাহিনী রয়েছে। এটি জ্যোতির্বিজ্ঞানের পর্যায়ে ফেলা যেতে পারে। একপদ বিশিষ্ট অজরূপী নক্ষত্র হলো মেন্টাসুর। সূর্যকে দক্ষিণায়ন থেকে উত্তরায়ণে যেতে বাধা দেয় মেন্টাসুর নক্ষত্র। এক সময় মেন্টাসুর ভস্মীভূত হলে রোদের বৃদ্ধি ঘটে, মানুষের কর্মে গতি আসে। ভৌগোলিক ব্যাখ্যাটি হলো— শীতকালে সূর্যের দক্ষিণায়নে থাকাকালীন পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধে রোদ কম পড়ে, দিন ছোট। মানুষের কাজের সময় বেশি পাওয়া যায় না। যে সময়ে হোলি বা দোল উৎসব সে সময় সূর্যের আলো শীত ঋতুর তুলনায় বেশি পাওয়া যায়। অর্থাৎ দিন বড়। কাজের সময়টা মানুষ বেশি পান। আসলে পৃথিবীর মাঝামাঝি কল্পিত বিষুবরেখাকে ধরে বছরের নির্দিষ্ট সময়ে ২৩.৫ ডিগ্রি পর্যন্ত অক্ষাংশে সূর্যের আলো পড়ে কখনও পৃথিবীর দক্ষিণ গোলার্ধে আবার কখনও উত্তর গোলার্ধে। একে সূর্যের উত্তরায়ণ (Summer Solstice) এবং দক্ষিণায়ণ (Winter Sostice) বলে। মেন্টাসুর নক্ষত্র— এও কল্পিত। সময়ই আসল, রোদের হ্রাস এবং বৃদ্ধির ক্ষেত্রে। ৬০ ডিগ্রি কোণ করে সূর্যের চার পাশে পৃথিবীর ঘোরা বার্ষিক গতির ফলে ঋতুর পরিবর্তন। এটাই হলো সময়। হোলি বা দোল উৎসবের পর থেকে সূর্যের আলোর তীব্রতা লক্ষ্য করা যায়।

হোলিকা দহন, চাঁচর বা বহ্ন্যুৎসব— যে নামেই উৎসব হোক না কেন, এই উৎসবের তাৎপর্য হলো— মেষ বা মেড়া হলো কামের প্রতীক। শ্রীকৃষ্ণকে পেতে হলে কামপ্রবৃত্তিকে সম্পূর্ণ দগ্ধ করে প্রেম-প্রবৃত্তির উন্মেষ ঘটাতে হবে। অর্থাৎ নিষ্কাম প্রেমের কথা বলা হচ্ছে।

চাঁচর বা বহ্ন্যুৎসবের শাস্ত্র বা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা যাই থাক না কেন, স্বাস্থ্যসম্মত ব্যাখ্যাও রয়েছে। বহ্ন্যুৎসবের জ্বলন্ত আগুনের তাপমাত্রা পৌঁছায় ১৪৫ ডিগ্রির কাছাকাছি। যাঁরা আগুনের কাছাকাছি থাকেন, তাঁদের ত্বকে বাসা বাঁধা ব্যাকটেরিয়ার মৃত্যু ঘটে এই তাপমাত্রার ফলে। পরের দিন হোলি বা দোল উৎসব।

সকালে রঙ আবির খেলা। বিকালে দোল উৎসব। শালগ্রাম শিলায় আবির মাখিয়ে সিংহাসনে বসিয়ে উত্তর ও দক্ষিণে দোল খাওয়ানো হয়। দোল এবং দোলের আগের দিন হোলিকাদহন উৎসবে (চাঁচরে) মেড়া পোড়ানোর অন্তর্নিহিত ব্যাখ্যা করেছেন জীবনকৃষ্ণ গোস্বামী তাঁর দোলযাত্রা নিবন্ধে।

মানুষের অহংকার হলো মেন্টাসুর বা মেড়াসুর। এই মেড়াসুর নামক অহংকারকে মনের আগুনে দগ্ধ করতে হবে। অর্থাৎ মানুষের নিজের অহংকারকে নিজেকেই নিবৃত্ত করতে হবে। জ্ঞানরূপ আবিরে আবৃত হয়ে চেতনা লাভ করা—আধ্যাত্মিক ধারণায় যাকে প্রাণকৃষ্ণের সাক্ষাৎ লাভ বলা হয়।

হোলি উৎসবের সূচনা :

হোলি উৎসবের সূচনা রাধাকৃষ্ণকে ঘিরে। এর আগে এদেশে মদনোৎসব প্রচলিত ছিল। মদনোৎসবের উৎস দক্ষিণ ভারতে— তামিলনাড়ুতে। এখানে হোলিকামন গণ্ডিগাই বা কামদহনম্ কাহিনী আছে। সতীর মৃত্যুতে শিব শোকস্তব্ধ। দেবতারা পার্বতীর সঙ্গে তাঁর বিয়ে দিয়ে শোক নিবৃত্ত করতে চান। ডাক পড়ল কামদেবের। প্রেমের স্পর্শমাখা তির শিবের

উদ্দেশ্যে তাঁকে ছুঁড়ে মারতে হবে। কামদেব তাই করলেন। প্রেম-তির স্পর্শ করতেই শিব ক্রুদ্ধ হয়ে কামদেবকে তৃতীয় নয়ন দিয়ে ভস্মীভূত করলেন। স্বামীকে ফিরে পাওয়ার জন্য স্ত্রী রতি পার্বতীর পায়ে পড়ে কেঁদে-কেটে অস্থির। পার্বতীর প্রার্থনায় শিব তখন কামদেবের অস্তিত্ব ফিরিয়ে দেন। তবে অনঙ্গ— অশরীরী অবস্থায়। প্রেমাসক্ত থেকে দূরে থেকে গেলেন রতি— বিরহিনী রতি। এটা স্মরণ করে তামিল সমাজ কামদহনম বা মদনোৎসব পালন করেন। রতির বিরহ বা যাতনা প্রশমিত করতে এই উৎসবে চন্দনকাঠ উৎসর্গ করার রীতিটি প্রচলিত।

আগে বলা হয়েছে, হোলি উৎসবের সূচনা রাধাকৃষ্ণকে ঘিরে। হোলি বা দোলের কেন্দ্রস্থল রাধার জন্মস্থান বারসানা গ্রাম। মথুরা থেকে ৪২ কিলোমিটার দূরে এবং নন্দগাঁও-এর দক্ষিণে ৮ কিলোমিটার দূরে এই বারসানা গ্রাম। কৃষ্ণ বারসানা গ্রামে গিয়ে সুন্দরী রাধার গালে রঙ মাখিয়ে দিতেন। রাধা শ্যামাঙ্গ কৃষ্ণের ওপর রেগে যেতেন। একসময় রাগ থেকে অনুরাগ। রাধার গালে রঙ দেওয়ার পর থেকে হোলিতে রঙ মাখানোর রীতি হয়ে দাঁড়ায়। কৃষ্ণ প্রতিবছর দলবলসহ বারসানা গ্রামে গিয়ে রাধা ও তাঁর সখিদের সঙ্গে রঙ খেলায় মেতে ওঠেন। রাধার সখিরা কম যান না। কৃষ্ণের দলবলকে তাড়া করেন। তাঁদের তরফে রঙ ছোড়াছুড়ি। এই ভাবে নান্দনিক খেলায় সবাই মেতে ওঠেন। সেই সময় থেকে মথুরা, বৃন্দাবন, নন্দগাঁও-এ হোলি খেলা চলে আসছে। এরপর সমগ্র উত্তর পশ্চিমভারতে। হোলিকে কোথাও কোথাও আবার হোরি উৎসব বলে অভিহিত করা হয়।

কৃষ্ণ দলবল নিয়ে রাধার গ্রাম বারসানাতে রঙ খেলতে গিয়েছিলেন, তারই স্মরণে এই অনুষ্ঠান।

হোলি-দোল-বসন্তোৎসব :

ফাল্গুনী পূর্ণিমার দিন বিষ্ণুর দোলযাত্রা। দোল-এর আভিধানিক অর্থ হলো দোলন, ঝুলন। দোলন থেকে দোলাযাত্রা কথাটা এসেছে। যাত্রা অর্থে গমন। সূর্যের গমনাগমন নিয়ে এই দোলন বা দোল। বৈদিক ঋষিরা বুঝেছিলেন পৃথিবীর ঋতু পরিবর্তনের মূলে সূর্যের অয়ন। বছরে দু'বার অয়ন হয়। উত্তরায়ণ এবং দক্ষিণায়ন। বৈদিক ঋষিরা সূর্যকে পালনকর্তা বিষ্ণু তথা ঈশ্বর হিসেবে দেখেছিলেন। (সূর্যই হলো জীবজগতের জীবনী শক্তির উৎস এবং পালনকর্তা।) বিষ্ণুরূপ এই সূর্যের উত্তরায়ণ এবং দক্ষিণায়নকে দোলনরূপে দেখেছিলেন। উত্তর দিকের দোলন (উত্তরায়ণে) দোলযাত্রা এবং দক্ষিণ দিকের দোলন (দক্ষিণায়নে) হিন্দোল বা ঝুলনযাত্রা রূপে অভিহিত হলো। প্রাচীনকালে ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথিতে উত্তরায়ণ ধরা হোত। সেই হিসেবে বিষ্ণুরূপ সূর্যের দোল ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথিতে। আগেই বলা হয়েছে দোল অর্থে দোলন। পরবর্তী সময়ে দেখা যায়, বিষ্ণুর প্রতীক করা হয়েছে শালগ্রাম শিলাকে। মন্দির থেকে বাইরে এনে এই শালগ্রাম শিলাকে একটি সিংহাসনে বসিয়ে তিনবার উত্তরে এবং দক্ষিণে দোলানো হয়। এরপর শালগ্রাম শিলায় ঈষৎ লাল গোলাপি রঙের আবির মাখানো হয়। কোথাও কোথাও আবার আবির মাখানোর পর শালগ্রাম শিলাকে দোলানো হয়। ঈষৎ লাল গোলাপি রঙ মাখানো হয় কেন? আসলের ভোরের সূর্যের রঙটাই তো এই রঙের। সূর্যের উদয় ও অস্তের সময় দিগন্তের আকাশও গোলাপি রঙের। প্রাচীনকাল থেকে দোলযাত্রায় গোলাপি রঙের আবির ব্যবহৃত হয়ে আসছে। বর্তমানে বিভিন্ন রঙের আবির ব্যবহৃত। যাক, দোলযাত্রায় রাধা কৃষ্ণের মূর্তি সাধারণত আনা হয়। মূর্তিযুগলের পায়ে আবির দেওয়া হয়। কোথাও কোথাও শালগ্রাম শিলার মতো রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তিকে সিংহাসনে বসিয়ে দোলানো হয়। দোলযাত্রায় আবিরের থালা কুশি আম (ছোট আম) দেখা যায়। আবির মাখানো কুশি আম হাতে হাতে দেওয়া হয়। অমৃত ফল হাতে ধরানো। সুখ আয়ু সমৃদ্ধি কামনায়।

সপ্তম শতাব্দীতে রাজা হর্ষ রচিত 'রত্নাবলী' নাটকে বসন্তোৎসবের উল্লেখ রয়েছে। পুরবাসীরা নগর সংকীর্তনে বেরিয়ে পড়তেন। হাতে তাঁদের যেমন আবির ছিল, তেমন রঙ খেলার জন্য ধারাযন্ত্রও (পিচকারি) ছিল।

ষোড়শ শতাব্দীর আগে থেকে বৃন্দাবনে আবির খেলার সঙ্গে রঙ খেলার প্রচলন ছিল। ষোড়শ শতাব্দীতে চৈতন্যদেব বৃন্দাবনে হোলিখেলা প্রত্যক্ষ করে বাংলায় হোলি বা দোলযাত্রার প্রচলন করেন। (তথ্য— রবিবার, বর্তমান, ১২.৩.২০০৬)।

চৈতন্য পরবর্তী যুগে বঙ্গদেশে দোলযাত্রা বা হোলি উৎসব প্রচণ্ডভাবে বেড়ে যায়। এবং এখনও অব্যাহত। কলকাতায় লাল দীঘি নামে যে পুকুরটি রয়েছে, এর নামকরণটি নাকি আবির কুঙ্কুমের রঙ থেকে এসেছে। শ্যামরায়ের দোলের সময় প্রচুর আবির খেলা হতো। পুকুরের জল আবির কুঙ্কুমের রঙে রাঙা হয়ে উঠত। তাই পুকুরটির নাম লালদিঘি।

সমগ্র ভারতবর্ষে যে দোল বা হোলি উৎসব অনুষ্ঠিত হতো অনেক লেখকের লেখা থেকে জানা যায়। একাদশ শতকে আলবেরুণী, দ্বাদশ শতকে জীমূতবাহন, ষোড়শ শতকে রঘুনন্দন তাঁদের লেখায় হোলি বসন্তোৎসবের কথা লিখে গিয়েছেন।

মুসলমানরা কি হোলি উৎসবে আকৃষ্ট হতেন? আল-বেরুণীর লেখায় যেমন হোলির উল্লেখ পাওয়া যায়, তেমন সমসাময়িক এক মুসলমান লেখক তাঁর রচনায় উল্লেখ করেছেন— 'শুধুমাত্র হিন্দুরা নন, মুসলমানরাও এই উৎসব পালন করতেন।' নবাব সিরাজদ্দৌল্লা কর্ণেল পিয়ার্সকে (এশিয়াটিক রিসার্চ-এর লেখক) বলেছিলেন— 'তিনি অভিজাত মুসলমান সম্প্রদায় হলেও উন্মত্ত এই উচ্ছ্বাসে মন এলিয়ে দিতে ভালো লাগত তাঁর।'.... এক মুঠো আবির নিয়ে হাজির হতে কসুর করতেন না তিনি।

মেবারের রাণা-রা রঙ খেলা বা বসন্তোৎসবে মেতে উঠতেন। তাঁদের চিত্রকলায় চিত্রিত হয়েছে বসন্তোৎসব বা হোলির দৃশ্যাবলী। ষোড়শ শতাব্দীর বিজয়নগরে হাম্পির এক মন্দিরের গায়ে হোলির দৃশ্যাবলি খোদিত আছে।

হোলি উৎসবের সময় নাচ গানেরও ব্যবস্থা আগে ছিল। উত্তর-পূর্ব ভারতে মণিপুরীরা ছ'দিন ধরে উৎসব পালন করেন। এই সময় ইয়োসাং ফেস্টিভাল (অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রচলিত) হোলির উৎসবের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। উৎসবগুলির দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য বিশেষ মণিপুরী নৃত্য 'থাবাল ছাংবা'

প্রদর্শিত হয়ে থাকে।

কবিগুরু শান্তিনিকেতনে ১৯২৫ সালে (বাংলা ১৩৩১ সালের ফাল্গুন মাস) আশ্রমকুঞ্জে প্রথম বসন্তোৎসবের আয়োজন করেন।

দেশ বিদেশে হোলি উৎসব

হোলি বা দোল উৎসব দেশ-বিদেশে পালিত ভিন্ন নামে ভিন্ন আচারে। তামিল সমাজ এখনও মদনোৎসব পালন করেন। মহারাষ্ট্র, গুজরাটে কৃষ্ণের মাখনচুরির মতো দৃশ্যটির অবতারণা করা হয়। পুরুষ মানুষরা পিঠে পিঠে দাঁড়িয়ে ননীর হাঁড়িটি ধরতে যান। এদিকে নীচে মহিলারা বালতি বালতি জল ছুঁড়ে দেন পুরুষদের পিঠে যাতে পুরুষরা ননীর হাঁড়ি স্পর্শ করতে না পারেন। পাঞ্জাবে গুরু গোবিন্দ সিং-এর প্রচলিত শারীরিক শক্তি, শৌর্য ও সাহস প্রদর্শন করে হোলি খেলা হয়। এর নাম হোলি মহল্লা। হরিয়ানায় বৌদি ও দেওরের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক রঙ খেলা হয়। এর নাম দুলারি হোলি। বৌদি ও দেওরের মধ্যে সৌহার্দ্য রক্ষায় এই দুলারি হোলি। হিমাচল প্রদেশের গ্রামে গ্রামে হোলি খেলার চল। গ্রামের মাঝে একটা বড় গামলায় বা পাত্রে রঙ গোলা জল রাখা হয়। ছেলেমেয়েরা ওই রঙ নিয়ে খেলা করে। পরস্পরকে রাঙিয়ে দেয়। এদের হাতে থাকে রঙিন লাঠি। বাজনা বাজানো হয়। বাজনার তালে তালে নাচ-গান। সন্ধেবেলায় আগুন জ্বেলে ওই রঙিন লাঠি পুড়িয়ে দেওয়া হয়।

বিভিন্ন রাজ্যে হোলি বা দোলের দিনে নৃত্য পরিবেশন করা হয়। শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনৃত্য সকলের কাছে আকর্ষণীয়। এই দিনে চৈতন্যদেবের জন্ম। তাঁর জন্মদিনে উৎসব পালন করা হয়।
খোল-করতাল-মৃদঙ্গ বাজিয়ে হরিনাম সংকীর্তন করা হয়। গুজরাটে বসাবা হোলিতে নাচগান হয়। হরিয়ানাতে ফাগ নৃত্য। রাজস্থানে চক্রি নৃত্য, গুজরাটে জনজাতিদের 'জানরিয়ো ঢোল নৃত্য', বিহারে 'যোগীরা হোলি' নৃত্য, মণিপুরে 'থাবাল ছাংবা' নৃত্য পরিবেশিত হয়। পাঞ্জাব, বিহার, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশে বসন্ত পঞ্চমী থেকে হোলি উৎসব শুরু হয়। শেষ হয় ফাল্গুনী পূর্ণিমায়। মণিপুরে তো ছ'দিন ধরে উৎসব হয়।

বিদেশে বহু ভারতীয় বসবাস করেন। বিদেশে তাঁরা হোলি উৎসব পালন করেন। সুরিনাম, ত্রিনিদাদ, গিনি, মরিশাস, নেপাল, পাকিস্তান, দক্ষিণ আফ্রিকা মায় আমেরিকাতে ভারতীয়রা হোলি উৎসব পালন করেন।

বিভিন্ন দেশে বসন্তকালীন উৎসব পালন করা হয়। ভিন্ন নামে ভিন্ন আচারে। পশ্চিম ইউরোপের কয়েকটি দেশে ক্যাথলিক সমাজে একমাস ধরে বসন্তোৎসব চলে। ফ্রান্সে এই উৎসবের নাম মার্দিগ্রা, ইতালিতে কার্নিভাল, জার্মানিতে কার্নিভাল ফাশিং, পোলাণ্ডে আরিনা, শ্রীলঙ্কায় তালুক, ইন্দোনেশিয়ায় পিউরো, চেকোশ্লাভাকিয়ায় রোলিয়া ধানব, থাইল্যাণ্ডে সঙ্গকান নামে উৎসবগুলি চলে। বিভিন্ন দেশে বসন্ত ঋতুটি উৎসবের উৎস। আবার উত্তর গোলার্ধের সঙ্গে দক্ষিণ গোলার্ধের বসন্তোৎসব একই সময়ে হওয়ার কথা নয়। কারণ সূর্যের অয়ন অনুযায়ী ঋতু— ঋতু অনুযায়ী উৎসব। দক্ষিণ গোলার্ধে বসন্তকাল উত্তর গোলার্ধে ভাদ্র-আশ্বিন মাসে হওয়াই তো স্বাভাবিক।

মজাদার অনুষ্ঠানটি হয় স্পেনে। স্পেনে ষাঁড় ও মানুষের মধ্যে লড়াই যেমন উপভোগ্য (যদিও নিষ্ঠুরতার লড়াই), তেমন আরেকটি প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান হল 'লা টোমার্টিনা'। আগষ্ট মাসের শেষ বুধবার অনুষ্ঠিত হয়। স্পেনের বুনোই শহরে জড়ো হন হাজার কুড়ি মানুষ। লাল পাকা টমেটো জড়ো করা হয় একশো চল্লিশ টন। এখানে টমেটো ছোঁড়াছুঁড়ির খেলা। এই খেলার উৎসটি হলো দুই বন্ধুর খাবার ভাগ নিয়ে বচসা। বচসা এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে, খাবার তো খাওয়া হলো না, বরং ছুঁড়ে ফেলা হলো। এই ঘটনায় পথচারীরা দোকানিরাও জড়িয়ে পড়েন। এটা স্মরণ করে 'লা টোমাটিনা' অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানের শেষে দেখা যায়, অধিকাংশ মানুষের গায়ে টমেটোর লাল রস। ধরে নেওয়া যেতে পারে, ওটাই স্পেনীয়দের হোলি। সারা বিশ্বে স্পেনের 'লা টোমাটিনা' উৎসবটি সংবাদ মাধ্যমে পৌঁছে গেছে।

হোলি-দোল-বসন্তোৎসবে দুটি আবশ্যিক জিনিস হলো তরল রঙ এবং শুকনো আবির চূর্ণ। ফাল্গুন মাস আসা মানে ঋতু পরিবর্তনের সময়। গা ম্যাজম্যাজে ভাব, কুয়াশায় সর্দিকাশি, আবার পক্স-এর সম্ভাবনা। ঋতু পরিবর্তনে প্রাণীদের শরীরে প্রচুর ব্যাকটেরিয়া জন্মায়। হোলি উৎসবের আগের দিন যে চাঁচর বা বহ্ন্যুৎসব হয়, এর কার্যকরী ভূমিকা রয়েছে।

বর্তমানে আবির বা রঙে ভেজাল থাকে। ভেজাল মিশ্রিত রঙ বা আবির ব্যবহার করলে চোখ ও ত্বকের মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে। গুণমানযুক্ত আবির বা রঙ ব্যবহার করা উচিত।

হোলি-দোল-বসন্তোৎসবে সাংস্কৃতিক ও সামাজিক গুরুত্ব অপরিসীম। হিন্দুরা দোল উৎসব পালন করে আনন্দ পান। ধর্মীয় উৎসব হলেও মানুষের চিন্তাভাবনা, সৌভ্রাতৃত্ব, প্রেম ও সখ্যতার দিকে। আবার উৎসবগুলি বৈষম্যহীন অপার আনন্দের দ্যোতক। চৈতন্যদেব যেমন সমাজের বর্ণগত, ধনগত, ধর্মগত বৈষম্য দূর করে মানুষকে একই প্ল্যাটফর্মে এনেছিলেন, তেমন ফাল্গুনী পূর্ণিমাতে তিনি বাংলায় দোলযাত্রা প্রবর্তন করে ধর্ম-বর্ণ, ধনী-দরিদ্রের ভেদাভেদ ঘুচিয়ে একাত্মীকরণ করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। তাঁরই প্রবর্তিত পথ ধরে সমগ্র পূর্বাঞ্চলে দোলযাত্রার বিস্তৃতি। বেশি খরচাও নেই। আবির কেনা তো সাধ্যের মধ্যেই। বর্তমানে আবার আবিরের উপস্থিতি রাজনীতি, খেলাধুলো, বিদ্যাস্থানে। ভক্তির আবির, জয়োল্লাসের উচ্ছ্বাস প্রকাশের আবির। সর্বোপরি মনের রঙে রঙ মেশাতে যার জুড়ি নেই— সেটি দোল বা বসন্তোৎসবের আবির।

তথ্য সহায়তা—

দোলযাত্রা - জীবনকৃষ্ণ গোস্বামী, বর্তমান, ১৬.৩.২০০৮।

বঙ্গে দোলখেলা — পবিত্রকুমার ঘোষ। দেশে বিদেশে নানা রঙের হোলি — সুচেতনা রায়। কখনও দোল, কখনও হোলি— কস্তুরী সেনগুপ্ত, সাপ্তাহিক বর্তমান, ১৫.৩.২০০৮।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ঋতুরাজ বসন্ত— স্বপ্ন কুমার ঘোষ, সাপ্তাহিক বর্তমান, ৬.৩.২০০৪।

কৃষি, কৃষক ও রাষ্ট্রীয় ভাবনা— সংকর্ষণ মাইতি, প্রেক্ষাপট, শারদ সংখ্যা, ১৪১৩।

নবাঙ্কুর

হোতু-কোতু উপাখ্যান

বসন্ত উৎসবে মেতে উঠল ছোটোরা, বড়োরা

সকলের সঙ্গে কথা বলার অভ্যেস হোতুর রয়েছে। নিজে বলে কম, শোনে বেশি। খুব ছোটো ছেলেমেয়ের কথা মন দিয়ে শোনার ধৈর্য রয়েছে তার। বড়োদের কথাও শোনে। শোনার সঙ্গে বা পরে নোট নেয়। একটা ছোট্ট খাতায় লিখে রাখে কার সঙ্গে কোন বিষয়ে কথা হলো। জরুরি কথা বা বিষয়গুলো সাজিয়ে রাখে। হোতুর এরকমই ক্ষেত্রে সার্থকতা এসেছে। হোতু সাফল্য বলতে চায় না। সার্থকতা শব্দটা ব্যবহার করে। এভাবেই রয়েছে সকলের পাশে।

পুরনো গল্প নতুনভাবে প্রচার নয়। হোতুর প্রতিটি দিনই নতুন। ভোরে ঘুম ভাঙার পর থেকে রাতে ঘুমোতে যাওয়া পর্যন্ত অনেক কাজ তার। অনেক কাজের ছবি তৈরি করা থাকলেও সব বাঁধা ছিল। চমৎকার সাজতে পারে তাপস রায় আর সাধন চক্রবর্তী। অল্প বয়েস। উৎসাহে ঘাটতি নেই। হারমোনিয়াম বাজবে না। সেতার এসরাজ বেহালা বাজবে। তার সঙ্গে মন্দিরা। ছোটোরা কেউ কেউ বিভিন্ন যন্ত্র বাজাতে জানলেও হোতু বলেছিল, ওদের পক্ষে পুরো অনুষ্ঠানে বাজানো সম্ভব নয়। বড়োরা থাকবে। তাদের সঙ্গে

কাজের ধারা। অনেকের সঙ্গে কথা বললেও মতামত নেয় ছেঁকে বুঝে বিশ্লেষণ করে। তফাত থাকে শুধু ছোটোদের বেলায়। তারা যে কোনও সময় কথা বলতে পারে হোতুর সঙ্গে। হোতু তাদের প্রতিটি শব্দ বাক্য মন দিয়ে শোনে। ছোটোরা খুব আপনজন ভাবে তাকে। কার কি প্রয়োজন মনে রাখে। নামও। হোতুর টেবিলে একটা বড় জারে থাকে চকোলেট। ছোটোরা নেয় খুশি হয়েই। অর্জুন যখনই আসে দুতিনটে চকোলেট খায়। সে অনেকেদিনই এক প্যাকেট চকোলেট আনে। হোতুর কৌটোয় ঢেলে দেয়। ছোটোরা যত সহজে কথা বলতে পারে বড়োদের তেমন সুযোগ নেই। কি বিষয়ে কথা বলতে চান তা না ভেবে গেলে মুশকিল। হোতু সরাসরি বলবে, 'আপনার নষ্ট করার অনেক সময় থাকলেও আমার নেই।' আবার কোনও গরিব মানুষ নিজের অসুবিধের কথা ঠিকমতো বলতে না পারলে হোতু জেনে নেয় সুন্দর ব্যবহার করে। এভাবেই সব কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা ভাবে। সে কোনও রাজনৈতিক দলের সদস্য নয়। কোনও আখের গোছানো অঙ্ককষা লোকজনের সঙ্গে ওঠা বসা নয়। সে নিজের সামর্থ্যে কিছু মানুষের উপকার করতে চায়। প্রচার চায় না একটুও। তার কাজের ধারাই এগিয়ে দেয় তাকে। ছোটোদের জন্যে যা যা উদ্যোগ নিয়েছে প্রতিটি সড়কে চলে না। ঢেউ আসে যায়। তার মধ্যে সবদিক সামলে যদি এগোনো যায় তাহলে অনেক কাজ সম্ভব— এটা হোতু বোঝে। কাজকর্ম তাকে ঘিরে থাকে বলেই আনন্দ পায়। হোতু ঠিক করল কয়েকজনের সঙ্গে আলোচনা করে দোলের দিন একটা অনুষ্ঠান করবে। ছোটোরা নাচ গান আবৃত্তি করবে। কোন জল রং বা খারাপ রং ব্যবহার হবে না। শুধু আবির ব্যবহার করা যাবে। খারাপ ধরনের আবির নয়। ভালো আবির যদি আনার ব্যবস্থা হয় তা ছোটোদের দেওয়া হবে খেলার জন্য। বড়োদের মধ্যে শুধু তারাই থাকবে যারা হোতুর বিভিন্ন কাজে সমর্থন জানায়। ছোটোদের নিয়ে ভাবতে চায়। দোল মানে তো যেমন খুশি রঙ মাখা নয়। নিজেদের নতুনভাবে রাঙিয়ে নেওয়ার কথাই বার বার বলল। দোলের উৎসবকে হোতুরা নাচ গান আবৃত্তিতে ভরিয়ে তোলার কথা ভাবল। অর্জুন কতকগুলো দায়িত্ব নিলো। সুন্দরভাবে চারদিক সাজানোর ব্যবস্থা হলো। একটা করে শুভেচ্ছাপত্র প্রত্যেককে দেওয়ার কথা ভাবা হলো। অনুষ্ঠান শেষে কিছু খাবারেরও ব্যবস্থা থাকবে। খাবার দেওয়ার দায়িত্বে থাকবে কোতু শিট্টু চিকলি। হোতু লক্ষ্য রাখবে সব কাজ হচ্ছে কিনা।

দোলের দিন বিকেলে অনুষ্ঠান। মেয়েরা এলো শাড়ি পরে। ছেলেরা পাজামা পাঞ্জাবি পরে এলো। মেতে ওঠার মতো পরিবেশ। দুটো খোল মাঝেমধ্যে ছোটোরা খোলকরতাল বেহালা সেতার এসরাজ একতারা বাজাবে। বেশ জমে উঠল অনুষ্ঠান। হোতু জানিয়েছিল, 'আড়াই ঘণ্টার বেশি অনুষ্ঠান হবে না।' সেভাবেই সাজানো হলো। হোতু দোল-উৎসব বলতে চায় না। শান্তিনিকেতনের ধাঁচে 'বসন্ত উৎসব' নাম দিলো। ছেলেরা বড় বড় করে লিখেছিল রঙ দিয়ে : 'রঙ যেন মোর মর্মে লাগে, আমার সকল কর্মে লাগে।' সেটা পিছনে রাখার ব্যবস্থা হতে জমে উঠল। ওই কথাই তো উৎসবের মূলকথা।

অনুষ্ঠানের সময় কেউ রঙ খেলবে না। অনুষ্ঠান শেষে রঙ খেলা। হোতুকে রঙ দিলো ছোটোরা। বড়োরা। হোতুও সকলকে দিলো। তারপর মিঠাই-এর প্যাকেট দেওয়া হলো সকলকে। প্যাকেট ভর্তি মিঠাই পেয়ে সকলেই খুশি। অর্জুন অনেক ছবি তুলেছে। হোতুর ছবি রয়েছে তার মধ্যে। ছোটোদের ছবি তোলাটাই আসল ব্যাপার। তাদের বিভিন্ন মেজাজের ছবি ধরে নিতে চায়। হোতু বলল, 'ছবিগুলো আমরা সাজিয়ে রাখবো কদিন বাদে। যারা নিতে চায় তাদের দেওয়া হবে।'

অর্জুন পুরোপুরি রাজি হোতুর কথায়।

কৌশিক গুহ

ছবি : রমাপ্রসাদ দত্ত

বই কথা কই

বই পড়ার অভ্যেস গড়ে তোলা

আমরা দলবেঁধে পড়তে পারি না। পড়তে চাই না। পড়ার জন্যে ভাবি না। পড়াশোনা জরুরি— এটা আমরা বুঝতে চাই না কেন? আসলে সকলে মিলে পড়ার আনন্দ পাওয়ার ব্যাপারটা যদি ছড়িয়ে না পড়ে তাহলে এগোবে কি করে? সুমন্ত খুব ছোটো থেকে বই পেয়েছে বড়োদের কাছ থেকে। বই পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পড়ে নিয়েছে। নিজেও সংগ্রহ করেছে অনেক বই। বাবার কাছে পরামর্শ পেয়েছিল, 'যে বই পড়বে তার সম্বন্ধে লিখে রাখবে একটা ছোটো নোট বুকে। তাতে বইটার একটা ছবি মনের পর্দায় সাজানো থাকবে। নিজের পড়ার ধারাও খুঁজে পাওয়া যাবে।' সুমন্ত অনেক বই সম্পর্কে নোট খাতায় লিখে রাখায় তার পড়ার আগ্রহও বেড়েছে। পরে অনেককে ওইভাবে সে পড়ার পরামর্শ দিয়েছে। কেউ কেউ বলে, 'কষ্ট করে বই পড়তে ভালো লাগে না।' সুমন্ত বলে, 'একটু কষ্ট হবে প্রথম দিকে অভ্যেস গড়ে তুলতে। একবার গড়ে উঠলে কোনও অসুবিধে হবে না। বরং তখন না পড়ে একটা দিনও কাটাতে ইচ্ছে করবে না।' সুমন্তর কথায় অনেকে নিয়মিত পড়ার অভ্যেস করেছে।

বইমিত্র

প্রশ্নবাণ

১. কোন্ বিষধর সাপ একবার ভালো মতোন খেলে কতদিন না খেয়ে থাকতে পারে?

২. কোন্ সাপ দেহের এক তৃতীয়াংশ উপরে তুলে ধরতে পারে? তা কতটা উপর পর্যন্ত ওঠে?

৩. সাপদের নিয়ে ভারতের কোথায় উৎসব হয়? উৎসবের নাম?

৪. 'নাগিনীকন্যার কাহিনী' কার লেখা?

৫. সাপের হাঁচি কারা চেনে? সাপের 'হাঁচি'র অর্থ?

উত্তর ১. গোখরো। দুমাস। ২. গোখরো। যে কোনও পূর্ণদেহী মানুষের বুক পর্যন্ত। ৩. মহারাষ্ট্রে। নাগপঞ্চমী। ৪. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। ৫. বেদেরা। সর্পচরিত্র জানা।

ছবিতে তফাত খোঁজা

উলটো পালটা

বইয়ের দোকানদার তাপস ভট্টাচার্যকে কোনও আমল দিতে চায় না প্রকাশক অরুণ দে। সে ব্যাঙ্কের টাকায় ব্যবসা করে। বই প্রকাশ তার কাজ। লেখকদের কাছ থেকে লেখা সংগ্রহ করে তা প্রেসে পাঠায়। প্রেস প্রুফ দিয়ে যায়। প্রুফ পড়ে দেন দক্ষ মানুষরা। মলাট আর ভিতরের ছবি আঁকেন নামকরা লোকজন। অরুণ লোকজনের সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলে। টাকা পয়সার ব্যাপারে একেবারে কৃপণ। কাউকে প্রাপ্য টাকা দিতে গেলে তার হাত কাঁপে। মনে ঝিম ধরে যায়। যারা বই বিক্রির জন্যে যায় তাদের কাছে থেকে টাকা আদায়ে তৎপর। সেই টাকার সবটাই লাভ নয় এটা বুঝেও বুঝতে চায় না অরুণ। কাগজওয়ালা, ছাপাখানা, চিত্রকর, লেখক, বাঁধাইকর্মী সকলেই পাওনা টাকা ঠিক সময়ে পায় না। অরুণের বাজারে সুনাম নেই। তাপস বলে, 'বই বেচে টাকা দিই আমরা। সে টাকা যদি লোকজনকে না দেয় তাহলে নিজেরই ক্ষতি করবে। এখন যে খুব কম লাভে ব্যবসা করতে হয়— এটা বুঝতে চায় না, পারে না।'

২

বাগনানের শুভেন্দু দত্ত নিজেকে সর্ববিদ্যা বিশারদ ভাবে। সকালে তার অফিস দশটা থেকে কলকাতায়। সে বাড়িতে গুছিয়ে খেয়ে দশটার ট্রেনে চড়ে। ট্রেন হাওড়ায় পৌঁছোতে সময় নেয় এক ঘণ্টার বেশি। হেলেদুলে সে বেরোয় স্টেশন থেকে। তারপর বাসে চড়ে কলেজ স্ট্রিট। সেখানে তখন দপ্তর চালু হয়ে গেছে। সে পাখা আর এয়ারকুলার চালিয়ে জিরোয় কিছুক্ষণ। তারপর চা খায়। তারপরের কাজ কাগজ পড়া। এরপর ব্যক্তিগত প্রয়োজনে অনেকগুলো ফোন করা। এক ঘণ্টা ধরে টিফিন খাওয়া। আধ ঘণ্টা অফিসের কাজ করা। চারটেয় ব্যাগ নিয়ে অফিস ছাড়া। শুভেন্দু তার চেনামহলে বলে, 'অফিসে বড় বেশি খাটাচ্ছে।

রামগরুড় সংকলিত

যিনি রাঁধেন তিনি চুলও বাঁধেন

প্রীতি বসু

'যিনি রাঁধেন, তিনি চুলও বাঁধেন'— প্রচলিত প্রবাদ বাক্যটি যে একেবারেই ঠিক, তা প্রমাণ করে দিয়েছেন 'মেরিকম'। 'মেরিকম' ভারতের যন্ত্রণাক্লিষ্ট, দুর্ভিক্ষ, আর্থ সামাজিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া মণিপুর রাজ্যের প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে উঠে আসা দরিদ্র কৃষক পরিবারের এক মহিলা। ছোট থেকেই পেটের ভাতের জন্য লড়াই করতে হয়েছে। ছোটবেলায় পড়াশুনোয় খুব একটা খারাপ ছিলেন না। কিন্তু বক্সিং-এর নেশা তাঁকে পেয়ে বসেছিল। কাজেই উচ্চ মাধ্যমিকে তিনি প্রথমে পাশ করতে পারেননি। পরে অভিভাবকের চাপে প্রাইভেটে পাশ করেন।

কিশোরী মেরির বক্সিং-এর প্রথম পাঠ ছিল গোপনে। স্থানীয় যুবক ডিঙ্গো সিং ১৯৯৮ সালে এশিয়ান গেমসে প্রথম সোনা জেতেন। ব্যাপারটায় মেরি বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে বক্সিং রিং-কে নিজের দ্বিতীয় ঘর করে নেবার কথা ভাবেন। গোপনেই তিনি বক্সিং-এর অনুশীলন চালিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু তাঁর 'রাজ্য চাম্পিয়ান' হওয়ার খবরটি স্থানীয় একটি সংবাদপত্রে ছবি সহ প্রকাশ হওয়ার পরই ব্যাপারটি আর গোপনে থাকে না, চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

পরবর্তীকালে মেরি হয়ে ওঠেন বিশ্ব চাম্পিয়ন। লন্ডন অলিম্পিকেই প্রথমবার মহিলাদের বক্সিং। প্রথমদিকে মেরিকে নিয়ে কিছুটা দ্বিধা ছিল। পাঁচ পাঁচটি বিশ্বজয়ই ছিল ৪৫ থেকে ৪৮ কেজি বিভাগে। সেখানে মেরিকে লড়তে হয়েছে ৫১ কেজিতে। কিন্তু লড়াই-এর ময়দানে নেমেই মেরি সব দ্বিধা কাটিয়ে দিয়েছেন। একে একে নানা সম্মানে ভূষিত হয়েছেন। প্রথমে 'অর্জুন', তারপরে 'পদ্মশ্রী'। বৃটেনের 'নিকোলা অ্যাডামস'-এর কাছে হেরে রূপো তিনি পাননি ঠিকই, কিন্তু সারা দেশ তাকে ধন্য-ধন্য করেছে। কারণ তাঁরা দেখেছেন যে একজন সাধারণ ঘরের মহিলাও স্বপ্ন দেখতে ও দেখাতে পারেন।

মেরি গ্রামের এক সাধারণ যুবককে বিয়ে করে বাবার বাড়ি ও শ্বশুর বাড়ি-র সবাইকে মানিয়ে নিয়েই সংসার করে চলেছেন। সন্তান পালন থেকে সংসারের সকল কাজই তিনি নিজের হাতে করেন। সংসারের আর্থিক স্বচ্ছলতা আনবার জন্য বক্সিং-এ ট্রেনিং দেবার ব্যবস্থাও করেছেন, আবার 'ইম্ফল'-এর বিধবাদের চালও বিলিয়েছেন। পাঁচ বছরের যমজ সন্তান-এর পরিচর্যা যেমন করেছেন, তেমনি পেশার স্বার্থে সন্তানদের রেখে বেরিয়েও পড়েছেন। ছেলে যখন হাসপাতালে তখন এশিয়ান চাম্পিয়নশিপে দেশের সাফল্যের জন্য তিনি লড়েছেন— হয়ে উঠেছেন 'লৌহ-মানবী'। আবার রিং থেকে বেরিয়েই সন্তানের জন্য আকুল হয়ে পড়েছেন— তখন তিনি 'মমতাময়ী-মা'। তিনি দেশকে বুঝিয়েছেন— পরিস্থিতি অনুযায়ী কঠোর-কোমলে সমন্বয় ঘটাতে হবে। তাহলেই অসম্ভব বলে কিছু থাকবে না।

কর্নম মালেশ্বরী ও সাইনা নেহালের পর ব্যক্তিগত বিভাগে মেরিকম ভারতের তৃতীয় মহিলা হিসেবে পদক হাতের মুঠোয় এনেছেন। মালেশ্বরী ও সাইনা দুজনেই ব্রোঞ্জ জিতেছেন, মেরিও অলিম্পিকে এককভাবে সেরা বীরাঙ্গনার সম্মান এনে দিয়েছেন। তাঁর এই সাফল্যের ফলে ভারতের বক্সিং ফ্যান-রা যেমন খুশি হয়েছেন, তেমনি ভারতের প্রত্যন্ত গ্রামের অনগ্রসর পিছিয়ে পড়া সমাজের মেয়েরাও ঘরের চৌহদ্দি ছেড়ে বক্সিং রিং-এ পা দেবার সাহস জোগাড় করেছেন— ফলে তাঁরা নিজেদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে পারবেন।

'মেরিকম' পাঁচবারের 'বিশ্ব চাম্পিয়ন'। এবারের 'অলিম্পিক'-এ তিনি চ্যাম্পিয়ন হতে পারেননি ঠিকই, কিন্তু তৃতীয় তো হয়েছেন। সারাদেশ অবশ্য তাঁর প্রয়াসকে যথেষ্ট মর্যাদা দিয়েছেন। কিন্তু তবুও কুণ্ঠিত মেরি অলিম্পিকের মঞ্চে দাঁড়িয়েই দেশবাসীর উদ্দেশ্যে ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে জানিয়েছেন তাঁর ব্যর্থতার কারণ— তিনি জানিয়েছেন —গ্রামে জন্মানোর অনেক প্রতিবন্ধকতা থাকে। আমাকে একটা সময় 'ইম্ফল' শহরে এসে ট্রেনিং নিতে হোত। যথেষ্ট কষ্ট সাপেক্ষ ছিল। কিন্তু কখনও দমে যাইনি। তাই এখন 'মণিপুর' থেকে 'বেঙ্গালুরু'-তে পাকাপাকি ভাবে চলে আসতে চাই। তিনি এও জানিয়েছেন যে— রিও ডি জেনেইরোর আগামী অলিম্পিকে তিনি পদকের রং বদলাবেন। এবার ব্রোঞ্জ, পরের বার রূপো কি সোনা— লড়াই তিনি থামিয়ে দেননি।

অতিথি কলম

অশোক মেহেতা

প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম ক্রয়ে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বন্ধ হোক

কাপ ও ঠোঁটের মধ্যে ফারাক অনেকটাই। অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের জন্য কেনা অগস্টা ওয়েস্টল্যান্ড ১০১ হেলিকপ্টারে রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায় জয়সলমীর থেকে পোখরানে উড়ে গিয়েছিলেন 'আয়রন ফিস্ট' নামে ভারতীয় বিমানবাহিনীর বিশেষ প্রদর্শনী দেখতে। এই প্রদর্শনী আয়োজিত হয় প্রতি দু'বছর ব্যবধানে। এখন ওই ১০১ কপ্টারের পরিবর্তে তিনি উড়ে যাবেন এম আই ৮ চপারে চড়ে। অন্য একটি চপারে যাবেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী এ কে অ্যান্টনী যাঁর সফরসঙ্গী হবেন বিরোধী নেতা যশোবন্ত সিং।

এ ডব্লু চপার বিশেষ ধরনের। চালকের আসন বাঁদিকে, অন্য চপারের মতো ডানদিকে নয়। তিন ইঞ্জিন বিশিষ্ট চপারটির রোটর (Rotor) ঘড়ির কাঁটার উল্টোদিকে ঘোরে। বিমানবাহিনীর চপার চালকদের মতে এই অতি নিরাপদ চপার চালানোর অনুভূতিই অন্যরকম। এম আই ৮ চপারগুলি আগামী এক বছরের মধ্যে ধীরে ধীরে বসিয়ে দেওয়ার কথা হলেও তা আপাতত হচ্ছে না, কারণ এই চপারগুলির ব্যবহারের সময়কাল আরও বাড়ানো হতে পারে যদি এ ডব্লু চপার কেনার চুক্তি বাতিল হয়ে যায়।

যদিও বিমানবাহিনীর আশা এই চুক্তি বাতিল হবে না, কারণ যদি চুক্তি একবার বাতিল হয়, তবে চপার কেনার বিষয়টা কম সে কম পাঁচ বছর ঝুলে থাকবে। ইংলন্ডের অগস্টা কোম্পানী ওয়েস্টল্যান্ডকে কিনে নেয় এবং অগস্টা-ওয়েস্টল্যান্ড ইতালির ভরতুকিপ্রাপ্ত ফিনমেকানিকায় বৃটেনের একটি সংস্থাকে নোটিশ জারি করে বলে যে তাদের কর্মপন্থা যেন সাফ-সুরোত হয়। সম্প্রতি বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরুন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে চুক্তিটি বাতিল না করতে অনুরোধ জানান এবং এ ডব্লু যাতে কালো তালিকা ভুক্ত না হয় তারও তদ্বির করেন, কেননা চুক্তি বাতিল হলে সামারসেট কোম্পানী যেখানে চপার তৈরি হয় সেখানকার মানুষেরা কাজ হারাবেন। তিনি ইউরোফাইটার টাইফুন নিয়েও তদ্বির করেন, কেননা ফ্রান্সের ভেসল্ট-কোম্পানী র‍্যাফেলর কাছে হেরে বসে আছে, আর ফ্রান্সের কোম্পানীর সঙ্গে চুক্তি হয়েই রয়েছে। ক্রিশ্চান মাইকেল যিনি একজন ভেসল্টের এজেন্ট বলে অভিযুক্ত, তিনি এক দশক আগে মিরাজ-২০০০ নিয়ে একটি চুক্তি করেন এবং র‍্যাফেলের পক্ষে তা সমস্যা হয়ে দাঁড়াতে পারে। বিমানবাহিনী বলছে যে, র‍্যাফেল যা তৈরি করবে তার মূল্যায়ন করতে হবে এবং উৎপাদন নীতি প্রস্তুত করতে হবে। এক লক্ষ কোটি টাকার এই সওদায় সরকার যদি সমস্যা তৈরি করতে না চায় তবে ২০১৪ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারে।

ফিনমেকানিকাকে কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করা হলে তা বাহিনীর ১৯৭ ইউ লি এইচ টেন্ডার বাতিল হয়ে যাবে। আর টেন্ডারের জন্য অধীর আগ্রহে তাকিয়ে রয়েছে ফরাসী ইউরোকপ্টার, ইউ এস শিকরোস্কি। ভারতের একশো বিলিয়ন ডলারের চুক্তি আগামী ৫-৭ বছরের মধ্যে সম্পাদিত হবে নৌ-বাহিনীর রাডার আর এয়ার ক্র্যাফট কেরিয়ার ডিজাইন প্রস্তুতের জন্য।

সম্ভবত এই প্রথম কোনও এক উৎকোচ প্রদানকারী উৎকোচ গ্রহীতার নাম বলে দিয়েছে এবং কী ধরনের সহায়তা তারা করেছে তাও জানিয়েছে। এটাও প্রথমবার যে, উৎকোচ প্রদানের বিস্তারিত বিবরণ ও প্রাপকের নাম জানানো হয়েছে। ব্রিগেডিয়ার সইনি যিনি মুখ্যত বিষয়টি স্বীকার করেন যে তৎকালীন বায়ুসেনা প্রধান এয়ার মার্শাল এস পি ত্যাগীর সহায়তায় চুক্তি সম্পাদন করিয়ে দেবেন— এমনি তথ্য উল্লেখ রয়েছে মিলান থেকে প্রকাশিত এক বয়ানে। এই গোপনীয় গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ফাঁস হয়ে যায় ইতালীয় এক আদালতের অনুসন্ধান থেকে।

সাধারণতঃ কমিশনের হার হলো সমগ্র চুক্তির আর্থিকমূল্যের ২ শতাংশ। ৩৬০০ কোটি টাকার এ ডব্লু ১০১-এর বরাতে যার পরিমাণ হলো প্রতিটি উড়ানের দাম পড়বে ৩০০ কোটি টাকা।

প্রশ্ন হলো, কেন উৎকোচ প্রদানকারীরা প্রাপকদের নাম ফাঁস করলো? তারা নামোল্লেখ করলো ত্যাগীর ভাইদের। কারণ বায়ুসেনার প্রধান এস পি ত্যাগীর সঙ্গে তাঁদের যোগসাজশ প্রমাণ করতে। একটি মহল মনে করছে যে, ষড়যন্ত্রের মূলপাণ্ডাদের বাঁচাতে তড়িঘড়ি পর্দা ফাঁস করে দেওয়া হয়েছে। উৎকোচের অর্থ কার কাছে পৌঁছেছে তা জানা রীতিমত এক চ্যালেঞ্জ। এরকমই দেখা গিয়েছিল বোফর্স এবং সু এম কে আই সুখোই ইন্ডিয়া বিমান কেনার ক্ষেত্রে।

যারা সুখোই বিমান কেনা নিয়ে যে দুর্নীতি হয়েছে তার তদন্তে নেমেছিল, দীর্ঘ আট মাস তদন্তের পর সানডে ম্যাগাজিনে বিশ হাজার শব্দের এক নিবন্ধ লিখে তারা তাদের দায় সেরেছে এবং সেটাও নব্বই দশকের মাঝামাঝি সময়ে। আমি সেই সময়ে যা লিখেছিলাম এখনও তার পুনরাবৃত্তি করতে পারি। তদানীন্তন নরসিংহ রাও সরকার চুক্তি সম্পাদনের আগেই সুখোইকে ২০০ কোটি টাকা দিয়ে দেয়। পরে ইউনাইটেড ফ্রন্ট সরকারের প্রথম পর্যায়ের প্রধানমন্ত্রী দেবেগৌড়া, পরে প্রধানমন্ত্রী আই কে গুজরাল দুজনেই এর ফয়দা ওঠান।

পরবর্তী এন ডি এ সরকারও এর লাভ ওঠায়। এই কেলেঙ্কারিতে রাজনৈতিক নেতাদের আত্মীয়-পরিজনের নাম যুক্ত হলেও দুর্নীতির আর্থিক লেনদেন কতটা কীভাবে হয়েছে তা এখনও অজ্ঞাত।

এ ডব্লু ১০১-এর দুর্নীতির প্রকাশ হয়ে যাওয়াটা সরকার ও বাহিনীর পক্ষে এত অস্বস্তিকর হোত না যদি প্রতিরক্ষামন্ত্রী অ্যান্টনি জেনারেল ভি. কে. সিংহের অভিযোগের বিরুদ্ধে সঠিক সময়ে ব্যবস্থা নিতেন। জেনারেল সিংহের অভিযোগ ছিল প্রাক্তন বিমানবাহিনীর প্রধান ঘুষ মামলায় জড়িত।

আর্থিক ঘাটতি শোধরাতে গিয়ে অর্থমন্ত্রী চিদাম্বরম ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, বর্তমান প্রতিরক্ষা বাজেট থেকে দশ হাজার কোটি টাকা মূলধনী খাত থেকে কাটছাঁট করা হবে। বড় বড় খাতে পাওনা যেমন আই এন এস বিক্রমাদিত্য, র‍্যাফেল, আগামী বছরে মেটানো হবে। 'চপার গেট' কেলেঙ্কারী এখন তিনটি 'সি'-র স্ক্যানারে— সি বি আই, সি ভি সি এবং ক্যাগ।

সবচেয়ে খারাপ হলো প্রতিরক্ষামন্ত্রী মি. অ্যান্টনির সাফ সুরত দুর্নীতিমুক্ত চরিত্র বছর বছর ধরে বাহিনীর কাজকর্মকে পিছনে ফেলে দিয়েছে। পরিণামে বিদেশী কোম্পানী যেমন ডেনল, সিঙ্গাপুর টেকনোলজি কানেটিক, ইজরায়েল এরোস্কোপ, জার্মানির রিহালমেটান এবং অবশ্যই বোফর্সকে কালো তালিকাভুক্ত করা হয়েছে আর বাহিনীর সাজ-সরঞ্জাম সওদা করতে পুনরায় টেন্ডার ডাকতে হয়েছে। এই কারণেই বোফর্স কেলেঙ্কারী সামনে আসার পর স্থলবাহিনীর জন্য আর কোনও গোলন্দাজী কামান কেনা হয়নি।

সময় এসেছে প্রতিরক্ষা সওদায় স্বচ্ছতা ফেরাতে নতুন ক্রয়নীতি প্রণয়ন করতে কমিশন গঠন করা হোক এবং সমগ্র ক্রয় পদ্ধতির খোল-নলচে বদলে সহজতর পন্থা অবলম্বন করতে হবে যাতে সরঞ্জাম কেনার ক্ষেত্রে কোনও অর্থ যেন ফেরত না আসে। সওদায় স্বচ্ছতা ফেরানো এবং বাহিনীর হাতে প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম যাতে সময়মতো ঠিকঠাক পৌঁছায় তা সর্বাগ্রে দেখা দরকার। বৃটেনে ২০০৯ সালে বারনায়গ্রেড রিভিউ ঠিক এই কাজটাই করেছিল। কিন্তু ভারতীয় পদ্ধতি ঠিক এর বিপরীতধর্মী। তারা চুক্তি বাতিল আর কোম্পানীগুলিকে কালো তালিকাভুক্ত করে থাকে।

অস্ত্র সওদায় এজেন্ট, কনসালটেন্ট, সার্ভিস প্রভাইডারদের ভূমিকা এড়িয়ে যাওয়া যায় না। ২০০১ সালে প্রতিরক্ষা মন্ত্রক নোটিশ জারি করে স্থানীয় এবং বিদেশী অস্ত্র এজেন্টদের তালিকাভুক্ত করতে আহ্বান জানিয়েছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত কেউই আসেনি। প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম সওদায় যদি দুর্ভাগ্যজনক রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ না হোত তবে এ ডব্লু ১০১ সওদা নিয়ে এত জলঘোলা হোত না এবং বাহিনীকে সুসজ্জিত রাখার প্রক্রিয়াও ঠিক থাকত। সময়ের দাবি মেনে বাহিনীকে অত্যাধুনিক রাখার প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখায় সরকার সচেষ্ট হোক।

এলাহাবাদ পূর্ণকুম্ভের জন্য প্রকাশিত হল

প্রয়াগ পূর্ণকুম্ভ

— লাল ঠাকুর

—: প্রাপ্তিস্থান :—

ঘোষ এন্ড চক্রবর্তী

(পাবলিশার্স এন্ড বুক সেলারস্)

১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতাঃ৭০০ ০৭৩

ফোন - ৯৭৪৯৪৩৮৪৮৮

SATYA NARAYAN ACADEMY

C.B.S.E. AFFILIATED HIGHER SECONDARY
RESIDENTIAL CO-EDUCATIONAL WITH
SCIENCE & COMMERCE STREAM
BOOK YOUR SEAT IMMEDIATELY.

CAMPUS AT : RAMAKRISHNA NAGAR
BANKURA - 722155

CONTACT - 9433175048 / 9732063765

ADVT.

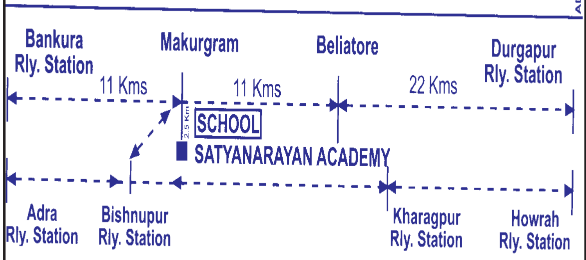

সাঈদীর ফাঁসির রায় তরুণদের বিজয়

ফারুক যোশী

সাঈদীর ফাঁসির রায় বলতে হবে তরুণদের বিজয়। ৫ ফেব্রুয়ারি গড়ে ওঠা গণজাগরণ মঞ্চ এবং দেশ-বিদেশে স্বতঃস্ফূর্তভাবে জেগে ওঠা বাঙালিরা যেন এককাট্টা হয়েছিল। এক দাবির প্রেক্ষিতে মানুষ একটা জায়গায় এক মোহনায় এসে মিলিত হয়েছে। প্রজন্ম চত্বরের গণজাগরণ সারা বাংলাদেশে যেন এক নতুন বিস্ফোরণের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। বলা যেতে পারে এ এক গণবিস্ফোরণ। এ বিস্ফোরণেই পরাজিত হলো আইনি প্রক্রিয়ায় স্বাধীনতাবিরোধী চক্র। দ্বিতীয়বারের মতো। সারা জাতি বলা যাবে না, স্বাধীনতার পক্ষে শক্তির এই বিজয়ে বাঙালি জাতির বৃহত্তম অংশটি যেন ঘুরে দাঁড়ালো।

এ বিজয়েও আছে আমাদের শোকগাথা। ফ্যাসিস্ট জঙ্গিদের হাতে আমরা প্রকৌশলী রাজীবকে হারিয়েছি, আবার হারিয়েছি এই গণজাগরণ মঞ্চেই স্লোগানরত আরেক তরুণকে। সাঈদীর ফাঁসির রায়ের মধ্য দিয়ে আমরা আবারও একাত্তরের সেই পরাজিত শত্রুদের তাণ্ডব দেখছি চতুর্দিকে। তারা সারা দেশটাকে করে তুলেছে আরেক রণক্ষেত্র। পবিত্র মসজিদকে ব্যবহার করছে, জ্বালিয়ে দিচ্ছে জায়নামাজ। মারছে নিরাপত্তা বাহিনীর কর্মীদের। ব্রেনওয়াশ হওয়া অসংখ্য অপেক্ষাকৃত কমবয়সী তরুণদের মাঠে নামাচ্ছে তারা। মিথ্যের বেসাতি দিয়ে ওদের ছেড়ে দিচ্ছে, আইনশৃঙ্খলা ভেঙে ধ্বংস করে দিচ্ছে আমাদের স্মৃতির মিনার। কিন্তু তারা জানে না, যে মিনার বাঙালিদের জাগিয়েছে কালে কালে, সেই মিনার ভাঙলে তরুণরা আরও জেগে উঠবে। অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে বাংলাদেশ। তা-ই হয়েছে। মিরপুর-মতিঝিল কিংবা গণজাগরণ মঞ্চের সমাবেশগুলো দেখেছি আমি, দেখেছে মানুষ। তারুণ্যের ফাঁসির দাবি দেখেছে জনতা। জয় বাংলা স্লোগানের পাশাপাশি জয় জনতা এ এক বিস্ময়কর জাদুতে যেন ফুঁসে ওঠা বাংলাদেশ। গণজাগরণ মঞ্চ প্রশ্নের ঊর্ধ্বে হয়তো নয়। কে বা কারা ফায়দা নিচ্ছে, সে কথাটি বিরোধী দল থেকে উচ্চারিত হয়েছে বারবার।

বিএনপি নেতারা বলছেন তরুণদের ব্যবহার করছে সরকার কিংবা আওয়ামী লীগ। আমরাও অস্বীকার করি না। বাংলাদেশের রাজনীতি এমন কোনও অবস্থানে নেই যে, ওভার নাইট বামপন্থীরা ক্ষমতার ভাগিদার হবে। এমনকি দূর ভবিষ্যতেও সে আশা করা যায় না। অনেকেই বলছেন, গণজাগরণ মঞ্চ জাগালো যে লাকী আক্তাররা, তারা আজ কোথায়? তারা আজও আছে। তারা ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছিল। সেই দাবিতে তারা আজও রাজপথ মাড়ায়। আওয়ামী লীগ তার রাজনৈতিক চরিত্র থেকে হয়তো সে ফায়দা নিতেই পারে। রাজনীতিতে সুযোগের সদ্ব্যবহার আছেই।

এটা কোনও অনৈতিক ব্যাপার নয়। তাছাড়া যুদ্ধাপরাধীদের বিচার আওয়ামী লীগ তথা মহাজোটের এ তো এক প্রধান কর্মসূচিও ছিল তা। বামপন্থী একটি ছাত্রসংগঠনের দু'জন কেন্দ্রীয় সভাপতির সঙ্গে আলাপ হয়েছে আমার। তাঁরাও অকপটে বলেছেন, যে ব্যাপারটা চাইছিলেন তাঁরা সেটি হয়ে ওঠেনি। সেজন্য তাঁরা কিছুটা অতৃপ্ত। কিন্তু তাঁদের শ্রমে জেগে ওঠা এই বিস্ফোরণের বিপরীতে যাবার কোনওই প্রশ্নই ওঠে না তাঁদের। সমাবেশে তরুণদের নিয়ে সম্মিলিত উপস্থিতি দেখেছি তাঁদের। আওয়ামী লীগের কিছু অর্বাচীন মুখপাত্রের সমালোচনা করলেও তাঁরা এক বাক্যে স্বীকার করেছেন প্রাজ্ঞ এবং প্রবীণ রাজনীতিবিদদের বিচক্ষণতার কথা। আওয়ামী লীগ সভানেত্রী যা করেছেন, তা আমাদের বিস্মিতই করেছে। এতো বিশাল জমায়েত, অথচ একটিবারের জন্য সেখানে না গিয়ে তিনি দলীয় অবস্থান থেকে দূরে রেখেছেন গণজাগরণ মঞ্চকে। স্বাভাবিকভাবেই শেখ হাসিনার উপস্থিতি হয়তো গণজাগরণ মঞ্চ পাল্টে যেতো, আওয়ামী লীগের স্লোগানে উচ্চকিত হয়ে যেতো গণজাগরণ মঞ্চ। এমনকি ঘণ্টার পর ঘণ্টা গণজাগরণ মঞ্চের পাশাপাশি থেকে দেখেছি, জয় বাংলার পাশাপাশি জয় বঙ্গবন্ধু স্লোগানটি পর্যন্ত উচ্চারণ করেনি ছাত্রলীগের কর্মী-সমর্থকরা। এটাও আমাকে বিস্মিত করেছে। তবে যে কথাটি স্বীকার করতেই হয়, বামপন্থী ছাত্র সংগঠনগুলোর কর্মী কিংবা

হিন্দুদের ওপর হামলার প্রতিবাদে শাহবাগে তরুণদের মিছিল।

সংস্কৃতিকর্মীদের কিছুটা ক্ষোভ থাকলেও গণজাগরণের মূল কনসেপ্ট থেকে কোনওভাবেই ওরা সরে আসেনি। আজকের বাস্তবতায় সরকারের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে হরতাল-সংগ্রাম-পুলিশ হত্যা করা মানে যুদ্ধাপরাধীদের পক্ষে কথা বলা। সুতরাং প্রয়োজনে যে কোনও ইস্যু নিয়ে আন্দোলনে আওয়ামী লীগের সঙ্গে থাকাটা এখন সময়ের দাবি।

আজ জাতি যেন এক দুটো ধারার মাঝ দিয়েই চলেছে। বিরোধীদলীয় নেতা সিঙ্গাপুর থেকে এসেই যেন একটা শক্ত অবস্থানে চলে গেলেন। শনিবার বিক্ষোভ মিছিল কিংবা মঙ্গলবারের হরতাল দিয়ে জাতিকে এক শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় ফেলে দিলেন তিনি। তাঁর এই কর্মসূচি ঘোষণার মধ্য দিয়ে তিনি নিজের অবস্থান স্পষ্ট করে দিলেন। সাঈদীর ফাঁসির রায়ের বিপরীতে জামাতের সঙ্গেই তার পথ চলাটা যেন তিনি বুক ফুলিয়ে ঘোষণা করে দিলেন। বিএনপি-র এ অবস্থানে আর কোনও রাখঢাক থাকলো না। পক্ষ-বিপক্ষটা আবারও প্রকাশ্যে চলে আসলো। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ বলে আর দাবি করার তাদের আর কোনও পথ খোলা রইলো না। বিরোধীদলীয় নেতা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের কথাবার্তায় যেন মনে হয়েছে চরম বেয়াদবি করতে নেমেছেন তাঁরা। 'হাসিনা তুই কবে যাবি' বাক্যটিতেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে মির্জা ফখরুলের রাজনৈতিক শিষ্টাচারের মাপকাঠি। জামাত-শিবিরের সন্ত্রাস দমন করতে গিয়ে পুলিশের গুলিতে নিহত মানুষদের গণহত্যার সঙ্গে তুলনা করেছেন বিরোধীদলীয় নেতা বেগম খালেদা জিয়া। দীর্ঘদিন পরে হলেও বিএনপি তার রাজনৈতিক শ্রেণী চরিত্রটি জনসমক্ষে এবার তুলে ধরেছে সোচ্চারে। মূলত মুসলিম লীগ, বিভ্রান্ত বাম, দক্ষিণপন্থী মৌলবাদীদের মিশ্রণে গড়ে ওঠা এ দলটি তার রাজনৈতিক দর্শন থেকেই দলটির নেত্রী এ কথাটি বলেছেন এবং ভারপ্রাপ্ত মহাসচিবও এরকম উক্তি করতে পারলেন। স্বাধীনতার মাসে যেখানে লাখ লাখ মানুষ হত্যার অভিযোগসহ মানবতাবিরোধী অপরাধ করার দায়ে বিচার হচ্ছে, সেখানে বেগম জিয়া তার বক্তৃতা দিয়ে যেন একাত্তরের গণহত্যার কনসেপ্টটাই ভিন্নপথে প্রবাহিত করেছেন। তিনি তাঁর বক্তৃতার মধ্য দিয়ে জাতির সামনে এখন দুটো পথই খোলসা করে দিয়েছেন। বিভক্ত করে দিয়েছেন গোটা জাতিকে। আওয়ামী লীগকে পছন্দ করতে হবে এমন কোনও কথা নেই। তবে রাষ্ট্রের আজকের ক্রান্তিলগ্নে সরকারকে সহায়তা না করার কি কোনও বিকল্প পথ আছে— এ কথা ভাবনায় নিতেই হবে স্বাধীনতার পক্ষের সব মানুষগুলোকে।

ত্রুটি-ব্যর্থতার মাঝ দিয়েই এগুচ্ছে সরকার। কিন্তু তবুও চল্লিশ বছরের দায়মুক্তির যে আলো সরকার দেখালো, তাতো সার্থকতারই একটি বিরাট মাইলস্টোন। এই মাইলস্টোন উপড়ে ফেলতে যারা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, তারা মূলত গোটা রাষ্ট্রকেই চ্যালেঞ্জ করে।

জাতি হিসেবে একটা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সে চ্যালেঞ্জ রাষ্ট্রদ্রোহিতার পর্যায়ে পড়ে। আর সেজন্যই গণজাগরণ মঞ্চ বলি কিংবা যে কোনও আন্দোলন-সংগ্রামই বলি না কেন, শুধু কর্মী কিংবা সংগঠক নন, এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সহযোগী হতে হবে দেশপ্রেমী সকল মানুষকে। এবং এই সহযোগিতা করতে হবে আমাদের স্বাধীনতা আর সার্বভৌমত্ব রক্ষার প্রয়োজনেই।

নেত্রদান মহাদান

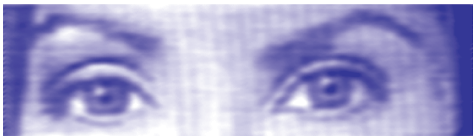

EYE BANK

23580201, 23341628, 23592931
Mobile - 9830333451

অনুসন্ধান ঃ 22181995, 22180387

সৌজন্যে ঃ কলাভারতী

PIONEER®

নিখুঁত লেখার খাতা

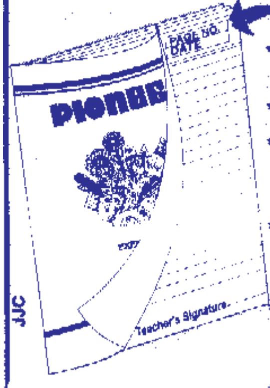

প্রতি পৃষ্ঠায় PAGE NO. DATE এর ঘর।
পাইওনিয়ার পূর্ব ভারতের সর্বাধিক বিক্রিত খাতা।
আদর্শ বাঁধাই ও সুন্দর সাইজ।
ভাল হাতের লেখার জন্য মসৃণ Creamwove & D.T.P.P. কাগজ ব্যবহার করা হয়।
প্রতিটি খাতায় সঠিক মার্জিন এবং লাইনিং। সর্বোত্তম গুণমান ও অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে তৈরী।
ব্যুরো অফ ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড নির্দেশিত IS: 5195-1969 নির্দেশিকা কঠোর ভাবে পালন করার প্রয়াস।
প্রতি পৃষ্ঠায় Teacher's Signature.................... কলাম।

PIONEER PAPER CO.
Off: 4a, Jackson Lane (1st floor)
Kolkata-1. Ph:350-4152, 353-0556
Fax:91-33-353-2596.
E-Mail:pioneer3@vsnl.net

PIONEER®
সঠিক গুণমানই আমাদের পরিচয়

ধর্মনিরপেক্ষীরা ইসলামের স্বরূপ সম্পর্কে অবহিত হোন

শ্রীচৈতন্য বর্ধন

সম্প্রতি প্রয়াত লেখক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় কোনও একটি সাহিত্য পত্রিকায় 'শেষ কথা' কলমে প্রশ্ন তুলেছেন :

"সন্ত্রাসবাদীদের আক্রমণ, যখন তখন বিস্ফোরণ, নিরীহ-নির্দোষ নারী-পুরুষ-শিশুর মৃত্যু; এর মাঝেমধ্যে এইসব অপকাণ্ডের জন্য যারা ধরা পড়ে, তারা অধিকাংশই মুসলমান। এদের নাম দেখলে আমার মুসলমান বন্ধুদের কথা মনে পড়ে। শুধু এ দেশের নয়, নানা দেশের মুসলমান বন্ধুদের মধ্যে কত গুণী বিদ্বান, শিল্পী এবং সূক্ষ্ম অনুভূতি সম্পন্ন মানুষ আছেন, এইসব বীভৎস ঘটনায় তাঁদের কীরকম প্রতিক্রিয়া হয়? আরও দুশ্চিন্তার কথা এইসব কাণ্ডের পর শুধুই মুসলমান নামে চিহ্নিত হয়ে তাঁদের প্রতি অন্য কেউ খারাপ ব্যবহার করার কিংবা প্রতিশোধ নেওয়ার চেষ্টা করে না তো?..."

তারপর তিনি প্রশ্ন করেছেন—"সন্ত্রাসবাদীরা ঠিক কী চায়? এত নির্দোষ মানুষকে হত্যা করে তাদের কী উদ্দেশ্য সাধিত হয়, তা কিছুতেই বুঝতে পারি না। নিছক ধর্মীয় উন্মাদনা কিংবা অশিক্ষা বা কুসংস্কার বলে ব্যাখ্যাও মানা যায় না, কারণ এদের মধ্যে অনেক মেধাবী উচ্চ শিক্ষিত তরুণও থাকে এবং ব্যক্তিগত জীবনে তারা খুব একটা ধর্মাচরণ করে বলেও জানা যায় না। তবে কি এরা সামাজিক অবিচারের প্রতিশোধ নিতে চায়? ধর্মাচরণের সঙ্গে সন্ত্রাসের কোনও সূক্ষ্ম সম্পর্ক আছে— এমন কল্পনা করাও অন্যায়। কোনও ধর্ম নিরপরাধ মানুষকে হত্যার পরামর্শ দেয় না।"

সুনীলবাবু বর্তমানে পরলোকগত, সুতরাং তাঁর প্রশ্নের জবাব তাঁর কাছে পৌঁছবে না। তবু যে সমস্ত হিন্দুর মনে সুনীলবাবুর মতোই ইসলাম ও মুসলমান সম্পর্কে প্রশ্ন জাগে, তাদের অবগতির জন্যই সেসব প্রশ্নের জবাব দেওয়া যেতে পারে। প্রথমত জানতে হবে মুসলমান কাদের বলে এবং তাদের উপাস্য আল্লাহ্‌র স্বরূপ কি? ইসলাম ধর্মের মূল ধর্মগ্রন্থ— কোরান। তার বয়ান অনুসারে— ইসলাম, আল্লাহ্ প্রবর্তিত একমাত্র সত্যধর্ম। যারা আল্লাহ্ ও হজরত মহম্মদের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য ও বিশ্বাস স্থাপন করে তারা হলো মুসলমান। অন্য সকলে হলো অবিশ্বাসী, অংশীবাদী, সত্য প্রত্যাখ্যানকারী ও কাফের।

ভারতবর্ষে কাফের হলো মূর্তিপূজক হিন্দুরা। আল্লাহ্ মুসলমানদের প্রতি পরম করুণাময়; কিন্তু অমুসলমানদের প্রতি তিনি নির্মম, কঠোর ও ভয়ঙ্কর। এই কাফেরদের সঙ্গে মুসলমানরা কিরকম ব্যবহার করবে এবং আল্লাহকে অমান্য করার জন্য কি ধরনের শাস্তি দেওয়া হবে তা আল্লাহ্ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। যেমন—

১. (ইসলামে) অবিশ্বাসীদের জন্য প্রত্যেক ঘাঁটিতে ওৎ পেতে থাকবে। যেখানে পাবে তাদের অবরোধ করবে। বধ করবে। বন্দী করবে।

২. (এই মূর্তিপূজক) কাফেরদের বিরুদ্ধে অবিরাম যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে— যতদিন কাফের ধ্বংস করে সারা বিশ্বে খোদার ধর্ম ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়।

৩. আল্লাহ্ ও তার রসুলে (মহম্মদ) যারা অবিশ্বাস করে আমি তাদের হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার করবো। তাদের সর্বাঙ্গে আঘাত কর। এদের জন্য রয়েছে নরকযন্ত্রণা।

৪. হে বিশ্বাসীগণ (অর্থাৎ মুসলমানগণ) তোমরা কাফেরদের বিরুদ্ধে (ভারতে হিন্দুদের বিরুদ্ধে) যুদ্ধ করবে। তোমাদের হাতে আল্লাহ্ ওদের শাস্তি দেবেন, তোমাদের ওদের বিরুদ্ধে জয়ী করবেন।

৫. (বিধর্মীদের বিরুদ্ধে) অভিযানে বেরিয়ে পড়ো— হাল্কা বা ভারী যে কোনও অস্ত্র নিয়ে। জান মান নিয়ে আল্লার

> **"কোরাণের নির্দেশ মতে দেশী বা বিদেশী কোনও বিধর্মীই মুসলমানের বন্ধু হতে পারে না। তাঁর বন্ধুদের মধ্যে গুণী-জ্ঞানী-শিল্পী এবং সূক্ষ্ম অনুভূতি সম্পন্ন মুসলমান থাকতে পারেন— কিন্তু বিধর্মীর উপর অনুষ্ঠিত বীভৎস ঘটনায় তাদের কোনও বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয় না।"**

নামে লড়াই করো।

৬. যুদ্ধে জয়ী হলে তোমরা বিপুল সম্পত্তির (অর্থাৎ লুঠের মালের) অধিকারী হবে এবং সেসব বৈধ ও উত্তম বলে ভোগ করবে।

৭. যুদ্ধে জয়ী হও বা নিহত হও, আল্লাহ্ জান্নাতে (বেহেস্তে অর্থাৎ স্বর্গে) তোমাদের জন্য মহাপুরস্কার দান করবেন। তোমাদের পরিবেশন করা হবে অফুরন্ত ভোগের সামগ্রী ও সুরা। অনন্ত যৌবনা, লজ্জা-নম্র, আয়তলোচনা এবং ডিম্বের মতো উজ্জ্বল গৌরবর্ণ সুন্দরী তন্বীগণ হবে তোমাদের সঙ্গিনী।

কোরানে এরকম অজস্র বিধর্মী বিনাশী লোভনীয় আয়াত বা বাণী রয়েছে। সাধে কি মুসলমানরা দাঙ্গাহাঙ্গামায় লাফিয়ে পড়ে। জন্ম থেকে তাদের কানে মক্তবে মাদ্রাসায় এসব হিংসাশ্রয়ী বিষ ঢালা হয়।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বেঁচে থাকলে তাঁর প্রশ্নের জবাব পেয়ে যেতেন। তিনি বারবার 'মুসলমান বন্ধু' বলেছেন। তিনি হয়তো জানতেন না— ইসলাম ধর্মে বিধর্মীকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করা নিষিদ্ধ। কোনও মুসলমানের পিতা বা ভ্রাতাও যদি অন্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয় তারাও বধযোগ্য। শাহজাহানের জ্যেষ্ঠপুত্র দারা'র পরিণতি স্মরণ করুন।

প্রয়াত সুনীল গাঙ্গুলীর আরও কটি জিজ্ঞাসার জবাব :

কোরাণের নির্দেশ মতে দেশী বা বিদেশী কোনও বিধর্মীই মুসলমানের বন্ধু হতে পারে না। তাঁর বন্ধুদের মধ্যে গুণী-জ্ঞানী-শিল্পী এবং সূক্ষ্ম অনুভূতি সম্পন্ন মুসলমান থাকতে পারেন— কিন্তু বিধর্মীর উপর অনুষ্ঠিত বীভৎস ঘটনায় তাদের কোনও বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয় না। হলে তারা দলে দলে এই বর্বরতার বিরুদ্ধে রাস্তায় নেমে পড়তেন। বরং কোনও সন্ত্রাসী পুলিশের হাতে মারা গেলে তারা তারজন্য শোকগ্রস্ত হন এবং দলে দলে জানাজায় হাজির হন।

সন্ত্রাসবাদীরা কি চায়? তারা সমস্ত বিধর্মীকে খতম করে খাঁটি ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করতে চায়— যেখানে বিধর্মীর চিহ্নমাত্র থাকবে না; তাহলেই তাদের সামনে বেহেস্তের দরজা খুলে যাবে। সমগ্র বিশ্বকে ইসলামীস্থান বানানই তাদের একমাত্র লক্ষ্য। ইসলাম ধর্মাচরণের সঙ্গে সন্ত্রাসের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক— এটা কল্পনা নয়; কঠোর এবং নিষ্ঠুর সত্য। তাই ইসলামধর্ম নিরাপরাধ মানুষকে হত্যার নির্দেশ দেয়। কারণ স্বেচ্ছায় ইসলামধর্ম গ্রহণ না করাটাই একটা অপরাধ। সে হিসেবে সমস্ত হিন্দুই ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের কাছে জঘন্য অপরাধী বলে গণ্য এবং সেহেতু বধযোগ্য। ইসলাম ধর্মের মর্মার্থ সম্পর্কে প্রয়াত সুনীলবাবুর দিব্যচক্ষু খুলুক এবং তাঁর মতাবলম্বী জীবিত ইসলামপ্রেমী ধর্মনিরপেক্ষীদের জ্ঞানচক্ষু উন্মিলীত হোক। কোনও ধর্ম নিরপরাধ মানুষকে হত্যার পরামর্শ দেয় না— তাদের এই ভুল ধারণার অবসান হোক। ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে তাদের মোহচ্যুতি ঘটুক।

আমরা ব্রজগোপ আসিয়াছি, গোপিনী কই?

সেই রজনীতে হরিধ্বনিতে সে প্রদেশভূমি পরিপূর্ণা হইল। সন্তানেরা দলে দলে যেখানে সেখানে উচ্চৈঃস্বরে কেহ 'বন্দেমাতরম' কেহ 'জগদীশ হরে' বলিয়া গাইয়া বেড়াইতে লাগিল। কেহ শত্রুসেনার অস্ত্র, কেহ বা বস্ত্র অপহরণ করিতে লাগিল। কেহ মৃতদেহের মুখে পদাঘাত, কেহ অন্যপ্রকার উপদ্রব করিতে লাগিল। কেহ গ্রামাভিমুখে, কেহ নগরাভিমুখে ধাবমান হইয়া, পথিক বা গৃহস্থকে ধরিয়া বলে, 'বল বন্দেমাতরম্, নহিলে মারিয়া ফেলিব।' কেহ ময়রার দোকান লুটিয়া খায়, কেহ গোয়ালার বাড়ী গিয়া হাঁড়ি পাড়িয়া দধিতে চুমুক মারে, কেহ বলে 'আমরা ব্রজগোপ আসিয়াছি, গোপিনী কই?' সেই এক রাত্রের মধ্যে গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে মহকোলাহল পড়িয়া গেল। সকলে বলিল, "মুসলমান পরাভূত হইয়াছে, দেশ আবার হিন্দুর হইয়াছে। সকলে একবার মুক্তকণ্ঠে হরি হরি বল।"

—'আনন্দমঠ' ৪র্থ খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ

—ঃ সৌজন্যে ঃ—

আশিস কুমার মঙ্গল

৩৩নং গোরাচাঁদ বোস রোড, কলকাতা-৭০০০০৬

অন্য রকম

জীবন রহস্যের খোঁজে বাসুদেব

বিরাজ রায়

বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টির তালিকায় শ্রেষ্ঠ হলো মানুষ। মানুষ যুগ যুগ ধরে করে চলেছে জীবনের উৎস সন্ধান। উদঘাটন করতে চাইছে সৃষ্টি রহস্য। তাতে মাধ্যম হিসেবে কেউ কেউ বেছে নিয়েছে বহিরিন্দ্রিয়কে— বিজ্ঞানকে। আবার কেউ কেউ অন্তরিন্দ্রিয়ের সাহায্যে ব্যস্ত সৃষ্টি রহস্য উন্মোচনে, যাকে বলা যায় আধ্যাত্মিকতা। এবারে আমাদের আলোতে এসেছেন এমনই এক সৃষ্টিসন্ধানী তরুণ বাসুদেব মণ্ডল। যে আধ্যাত্মিকতার আধারে জানতে চাইছে জীবন তত্ত্বকে। সে জানতে চায় জীবনকে, জীবনের সৃষ্টিই বা কোথা থেকে? তবে বয়সটা নেহাতই কম, সবে একুশ। যারা বলে এসব ধর্মকর্মের ব্যাপার-ট্যাপার শেষ বয়সে করতে হয়, তাদের কাছে খুবই অস্বস্তিকর।

কলকাতা বিদ্যাসাগর কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। পড়াশুনার পাশাপাশি সে চালিয়ে যাচ্ছে তার ধর্মচর্চা। জীবনের সৃষ্টি রহস্যকে জানতে পড়ে ফেলেছে ঢাউস ঢাউস ধর্মগ্রন্থ। কলেজের শেষে একটু সময় পেলেই তাকে ঢুঁ মারতে দেখা যায় কলেজে স্ট্রিটের পুরানো বইয়ের দোকানে। মনের ক্ষুধাকে মেটাতে খুঁজে খুঁজে বার করে এই সব বিষয়ের নানা বই। ফলে বাড়িতে বইয়ের আলমারি ভর্তি হয়ে গেছে গীতা, উপনিষদের মতো নানা ধর্মগ্রন্থে। বন্ধু, প্রতিবেশী অনেকের চোখে বিচিত্র লাগে, কিন্তু এটা যেন তার সাধনা। সে চায় সাধনার ফল পেতে। বাইরের সমালোচনা যেন তার কানেই আসে না।

বারুইপুরের বাড়িতে মা ও দিদির সঙ্গে থাকে বাসুদেব। সেখানে দুটো ঘর নিয়েই তাদের সংসার। দিদি একটি স্কুলের শিক্ষিকা। দিদির আয়ই একমাত্র আর্থিক সংস্থান। কিন্তু বাড়ির প্রত্যেকেই প্রগাঢ় ঈশ্বর ভাবনায় ভাবিত, খামতি নেই ভক্তিভাবের। বাসুদেব জানিয়েছে, তার এই জানার আগ্রহকে আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে মা ও দিদির উৎসাহ। একসময় তারা বাবার সঙ্গেই থাকতো। কিন্তু এক বছর আগে বাবার থেকে আলাদা হতে হয়। তার একটি কারণও তাদের এই ধর্মচর্চা। বাবার এসব পছন্দ ছিল না, ফলে মতে মিলছিল না। তারপরেই তারা উঠে আসে স্টেশন পল্লীর এই ভাড়াবাড়িতে। তবে বাবাই যে শুধু মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে তা নয়, তামাশা টিটকিরির পাত্র হতে হচ্ছে বন্ধু প্রতিবেশীদের কাছেও। কিন্তু এই তুচ্ছ বিষয়গুলোকে পাত্তা না দিয়ে বাসুদেব নিজের মতো এগিয়ে চলেছে। ও মনে করে— 'ওরা আমাদের চিন্তা-ভাবনাকে বুঝতে পারছে না, তাই এধরনের আচরণ করছে। আমি ওদের থেকে শুধু এখানেই আলাদা যে ওরা এই বিষয়টাকে জানতে চাইছে না, আর আমি জানতে চাই।' এ নিয়ে বিতর্কেরও শেষ নেই। কোনওদিন হয়তো সমাধান মেলে, কোনওদিন মেলে না। কিন্তু বাসুদেবের তা নিয়ে কোনও আক্ষেপ নেই। বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দেওয়ার সময় অনেকে হয়তো ইচ্ছে করেই বিরূপ মন্তব্য করে, জিজ্ঞেস করে বিভিন্ন প্রশ্ন। কিন্তু শান্তভাবে সে যতটা পারে উত্তর দিয়ে যায়। কারণ তার ইচ্ছে, বন্ধুদের মধ্যেও এই ধর্ম ভাবনা আসুক।

বাসুদেবের দিদি ভাইয়ের এই চিন্তার বিকাশকে আরও এগিয়ে দিতে চাইছেন। তিনি জানিয়েছেন— 'মানুষের শেষ বয়সে ধর্মে মতি হয়, ভাইয়ের সেটা এখনই হয়েছে। এটা তো আমাদের সৌভাগ্য। আর এখন থেকে এসব করলে জীবনের অনেক বেশি সময় ধর্মচর্চা নিয়ে কাটাতে পারবে। ধর্মতত্ত্বে সৃষ্টির সন্ধানে মা ও দিদিই হয়তো এখন বাসুদেবের একমাত্র শক্ত অবলম্বন।

জীবনের প্রতি পদে
থাকে যদি ডাটা
জমে যায়
রান্নাটা
DUTA
Chicken Mutton
Sabji Mix
Kashmiri MIRCH POWDER
SUPER Cumin Powder
SUPER Turmeric Powder
Chilli Powder
SUPER Coriander Powder
BLACK Pepper powder
ডাটা
গুঁড়ো মশলা ও পাঁপড়
কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (কুক্‌মী) প্রাঃ লিঃ

পুস্তক প্রসঙ্গ

স্বাভিমানহীন ব্যক্তিরাই ভারতীয় ইতিহাসকে বিকৃত করে চলেছেন

সুকেশ মণ্ডল

কোনও জাতি বা সমাজ আত্মবিস্মৃত হয়ে তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য যদি হারিয়ে ফেলে তাহলে পরাধীনতা গ্রাস করে। পরাধীন জাতির একাংশের মধ্যে এক অদ্ভুত মানসিকতা লক্ষ্য করা যায় আর তাহলো বৈদেশিক জাতির গুণগ্রাহী হয়ে নিজ সমাজে গণ্যমান্য হবার প্রবণতা। প্রায় হাজার বছর বিদেশী শাসনে ভারতবর্ষের সমাজ জীবনের শুভ দিকগুলিতে এরকম স্বাভিমানহীন ব্যক্তিরাই ভয়াবহ বিকৃতি সৃষ্টি করে চলেছেন। এদের হাতেই ভারতের ইতিহাস অন্ধকারের চোরাগলিতে পথ হারিয়ে ফেলেছিল। এই সমাজেরই অন্য একটি অংশ যারা মনের দিক থেকে কোনওদিন পরাধীনতাকে স্বীকার করেননি, তাঁরা কিন্তু কঠিন হলেও সত্যানুসন্ধানে ব্রতী থেকেছেন। পুস্তকের প্রথম ভাগে ভারতবাসীর সভ্যতার ধারবাহিকতায় লেখক ড. কৃষ্ণকান্ত সরকার গভীর অনুসন্ধান করে 'ঋগ্বেদ অসভ্য বর্বরদের অপরিপক্ক আদিম সঙ্গীত ও অন্যান্য বেদ শুধুমাত্র ভেলকির বই' তত্ত্বটি নস্যাৎ করে হরপ্পা- মহেঞ্জোদড়ো, অধুনা বিলুপ্ত সরস্বতী নদীর তীরের সারস্বত সভ্যতা, মেহেরগড় সভ্যতা এবং এগুলি থেকে প্রাপ্ত প্রত্ন নিদর্শন এবং ঋগ্বেদে বর্ণিত তথ্য পরিবেশন করে পাশ্চাত্য পণ্ডিত ও তথাকথিত 'গণ্যমান্য' পণ্ডিতদের ভারতবর্ষকে হীন প্রতিপন্ন করার 'আর্য আক্রমণ তত্ত্ব'-কে খারিজ করে দিয়েছেন। নতুন প্রজন্মের ইতিহাসের ছাত্রদের জানা উচিত যে আর্য আগমন বিষয়ে গবেষকদের মধ্যে কেউই ভারতীয় ছিলেন না। সুতরাং এটা ছিল বৃটিশদের ভারতবর্ষকে হীন প্রতিপন্ন করার চক্রান্ত মাত্র। শুধু ইংরেজ বা মুসলিমরা এদেশে বহিরাগত নয়, ভারতের মূল সমাজও বহিরাগত অর্থাৎ সবাইকে একাসনে বসিয়ে নিজেদের আধিপত্যকে বৈচারিক দিক থেকে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে এই চক্রান্ত।

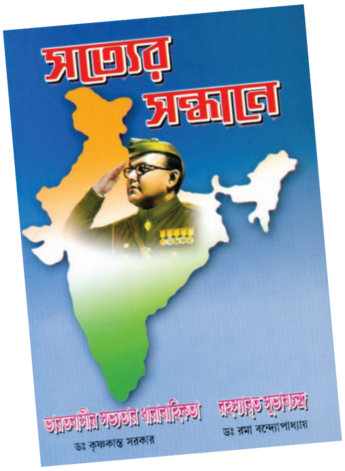

পুস্তকটির দ্বিতীয় অংশে লেখিকা ড. রমা বন্দ্যোপাধ্যায় নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর অন্তর্ধান রহস্যের আবরণ উন্মোচনের যুক্তিগ্রাহ্য চেষ্টা করেছেন। এখানেও কায়েমীস্বার্থের চক্রান্তের গলিঘুঁজিতে বর্তমান প্রজন্ম নেতাজীর মৃত্যুরহস্যের কুলকিনারা পায় না। লেখক স্বল্প পরিধির মধ্যে সুন্দরভাবে সেই রহস্যভেদ করার চেষ্টা করেছেন। সরকারি তরফেই এই রহস্য উন্মোচন হোক, দেশবাসী এই আশা করেছিল, কিন্তু সরকারি কোনও প্রচেষ্টা তো হয়ইনি, বরং সরকারের পক্ষ থেকে নেতাজীকে মরণোত্তর সম্মান প্রদান করা ও জাপানের রেনকোজি মন্দিরে রক্ষিত চিতাভস্ম ভারতে আনার কথা বলে 'নেতাজী মৃত' তত্ত্বকেই প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা হয়েছে। এ ব্যাপারে কোনও এক বাজারী সংবাদপত্রের উৎসাহও প্রচুর। লেখিকা একজন বিশিষ্ট নেতাজী গবেষক ও মুখার্জি কমিশনের অন্যতম সদস্য। তিনি একের পর এক তথ্য উত্থাপিত করে প্রমাণ করেছেন বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যু হয়নি, তাই তাঁর চিতাভস্মের কোনও অস্তিত্বই নেই। রেনকোজি মন্দিরে রক্ষিত চিতাভস্মটি কার তারও যথাযোগ্য প্রমাণ তিনি রেখেছেন। যদি কোনও ব্যক্তি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মিত্রশক্তি ও অক্ষশক্তির কূটনৈতিক খবরাখবর বা কাজকর্ম অনুধাবন করেন (পড়েন), তাহলে সহজেই বোধগম্য হবে যে বিমান দুর্ঘটনার প্রচার একটি কূটনৈতিক কৌশল মাত্র। যুদ্ধের প্রথমদিকে অপ্রতিহত দুর্বার অক্ষশক্তির মনোবল ভেঙে দেওয়ার জন্য বৃটিশ রেডিও যে 'তাইহোকুতে বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজী মৃত' বলে প্রচার করেছিল তা ধোপে টেকেনি। অক্ষশক্তির পতনের পর জাপানের এই প্রচারের তাৎপর্য হলো— একজন প্রখর দেশভক্তকে যুদ্ধাপরাধী হিসাবে মিত্রশক্তির দেশগুলো যেন বন্দী করতে না পারে। তাঁর বেঁচে থাকা উচিত।

লেখকদ্বয় স্বল্প পরিসরে বর্তমান প্রজন্মকে সঠিক তথ্য ও স্পষ্ট ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। আমরা তাঁদের নিকট কৃতজ্ঞ।

সত্যের সন্ধানে। ড. কৃষ্ণকান্ত সরকার ও ড. রমা বন্দ্যোপাধ্যায়। চারুপত্র প্রকাশনী। ৫০ টাকা।

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী
নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।
শান্তিনিকেতন, বোলপুর
ফোন - (০৩৪৬৩) ৫৬২২২

সিঁদুরে মেঘ এবং উদ্বিগ্ন দেশবাসী

দেবী প্রসাদ রায়

শ্রীনগরে সাম্প্রতিক জঙ্গি হাঙ্গামায় নিহত জওয়ানের দেহ নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

কোনও কাগজের হেডলাইন 'ভারতের হুমকির কাছে সীমান্তে বৈঠকে পাকিস্তান'— সম্পাদকীয় 'ঠ্যালার নাম বাবাজী', কোথাও প্রতিবেদনে 'চীনের সঙ্গে আসন্ন সামরিক মহড়ার সম্ভাবনায় ভারতের স্বস্তিবোধ কিছুটা...।' এই সবের জন্য দেশবাসী ভীষণ উদ্বিগ্ন। হঠাৎ করে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতীয় সৈন্যের উপর আক্রমণ, গুলি করে হত্যা, মাথা কেটে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ অস্বীকার করা এগুলির নেপথ্যে চীনের কোনও 'গেমপ্ল্যান' আছে--- আমাদের রাজনৈতিক নেতারা, সামরিক বিশেষজ্ঞরা একবারও ভাবছেন বলে এখন অবধি দেখতে যাচ্ছি না। একবারও কেন মনে হচ্ছে না যে পশ্চিম সীমান্তে পাকিস্তানকে দিয়ে যুদ্ধ শুরু করিয়ে দিয়ে পূর্ব সীমান্তে 'অরুণাচল' দখল করে নেওয়ার অভিসন্ধি অচিন্ত্যনীয় নয়।

পাকিস্তানী সৈন্যের বর্বরতা এবং তাকে নিয়ে সৃষ্ট উত্তেজনা, পালটা ১০ জন পাক সৈন্যের মুণ্ড দাবি করার মতো রাজনৈতিক প্রজ্ঞাহীনতা প্রকাশ চীন উপভোগ করছে মাত্র। ভারতীয় বৈদেশিক নীতির হাস্যকর দুর্বলতা ও কূটনৈতিক জ্ঞানের অপরিপক্কতা শক্তিশালী দেশ তো বটেই, দুর্বল দেশগুলিও যতটা সম্ভব ব্যবহার করতে পারে, করে যাচ্ছে।

পাকিস্তানী সৈন্যদের বর্বরতা তার ঐতিহ্যের অঙ্গ। এই ঐতিহ্য সে লাভ করেছে তাদের একদা পূর্বসূরীদের কাছ থেকে যারা অভিযানকারীর বেশে ভারতে এসে সারা ভারতবর্ষকে রক্তাক্ত করেছে। লক্ষ লক্ষ মানুষকে নৃশংস হত্যা ও ধর্মান্তরকরণের মাধ্যমে আকাশ বাতাস আর্তনাদ মুখরিত করেছিল, শাসনাধিকার দখল করেও সেই নৃশংসতার পুনরাবৃত্তি চালিয়ে গেছে বছরের পর বছর। আওরঙ্গজেবের নৃশংসতা, ভাই দারাশিকোর ছিন্নমুণ্ড পিতা সাজাহানকে ভেট দেওয়া— এই আদর্শের উত্তরসূরীরা কোনও সভ্য আচরণের নজির রাখবে— এটা তো ভাবাই ভুল।

সুদূর অতীতের ইতিহাস এবং অদূর ইতিহাসেও একই বর্বরতার ধারাবাহিকতার কথা যারা বিস্মৃত হয়েছে বা বিস্মৃত থাকছে, তাদের হাতে দেশ কি নিরাপদে? সাম্প্রতিক দুই জওয়ানের নৃশংস মৃত্যু নিয়ে রাষ্ট্র নায়কদের উদ্বেগ প্রকাশ, যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার প্রতিশ্রুতি— নাটক মাত্র।

সেই কাশ্মীরে পাকিস্তানি হানাদারীর সময় থেকে প্রথম প্রধানমন্ত্রী নেহরুর বিদেশ নীতি যা সক্ষম প্রতিরক্ষা বিভাগকে পঙ্গু করে রেখে ভারতের স্বার্থকে বিকিয়ে দিয়ে এসেছে, এখনও তা অনুসৃত হচ্ছে। তার ফলে 'বিদেশ দপ্তর' স্রেফ 'তীব্র প্রতিবাদ জানানোর দপ্তর' মাত্র। তিব্বতসহ ভারতের ভূমি গ্রাস করার দুরভিসন্ধি মতো চীন যখন 'মানচিত্র যুদ্ধ' এবং তার সঙ্গে সীমান্ত লঙ্ঘন করে ভারতে অনুপ্রবেশ করে যাচ্ছে, চীনা বিমান ভারতের আকাশসীমা লঙ্ঘন করছে সেই সময় থেকে ভারতের বিদেশ দপ্তর 'তীব্র প্রতিবাদ পাঠানো'র দপ্তরে পরিণত হয়েছে। নেহরুর প্রবর্তিত নীতির জন্য সমস্ত দেশ বর্বরতার শিকার। পরিবারগুলি যখন উপযুক্ত প্রতিকার চাইছে, বিদেশমন্ত্রী সলমন খুরশিদ জানাচ্ছেন বদলা'র কথা তিনি ভাবছেন না। দেশবাসীর পূর্ণ আস্থা আছে প্রতিরক্ষা বাহিনীর উপর কিন্তু কার্যত দেখা গেছে বিদেশ মন্ত্রকের ক্লীবতাই হতাশাব্যঞ্জক। পাকিস্তানবাহিনী ১৯৬৫ সালের যুদ্ধে লেঃ মজুমদারকে হাত পা বেঁধে, গলার নলি কেটে, চোখ উপড়ে হত্যা করে, কারগিল যুদ্ধে ৭ জন ভারতীয় সৈন্যকে অতর্কিতে

আক্রমণ করে হত্যা করে একজনের কাটা মুণ্ড নিয়ে গেছে জনৈক পাক সৈন্য, তাকে পারভেজ মুশারফ সম্বর্ধনা জানান। পাকফৌজ এই সব সংস্কৃতির অধিকারী। কিন্তু জেনেভা কনভেনশনে বিরোধী এই সব পৈশাচিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ভূমিকা নেয়নি কেন বিদেশমন্ত্রক? দেশবাসী কী করে বিশ্বাস করবে যে এই নারকীয় মুণ্ডচ্ছেদের বিরুদ্ধে বিদেশমন্ত্রক রাষ্ট্রসঙ্ঘে যথাযথ ভূমিকা পালন করবে?

কিন্তু এইসব হতাশা, মনোবেদনা, জ্বালা যন্ত্রণা ছাপিয়ে যা থেকে যাচ্ছে তা হলো চীন আক্রমণ নিয়ে দেশবাসীর শঙ্কা। চীন ক্রমাগত সীমান্ত লঙ্ঘন করছে, অনেকটা ভিতরে ঢুকে ভারতীয়দের হুমকি দিয়ে যাচ্ছে, লাদাখ লে'তে উন্নয়নমূলক কাজকর্ম বন্ধ করে দিয়ে যাচ্ছে এবং তার বিরুদ্ধে ভারত সরকার উটের মতো বালিতে মুখ গুঁজে থাকছে— বিদেশমন্ত্রক এসব ক্ষেত্রে তীব্র বা মৃদু কোনও প্রতিবাদই করতে পারছে না। প্রতিরক্ষা দপ্তর কেন আছে, কেনই বা অস্ত্রশস্ত্র কেনার জন্য বিপুল ব্যয়, কেনই বা প্রতিরক্ষা গবেষণায় জনগণের অর্থ ব্যয়— দেশবাসী বুঝতে পারছে না। বাংলাদেশ যুদ্ধের সময় একবারই ভারতীয় সৈন্য অনুপ্রবেশকারী চীনা সৈন্যদের খেদিয়ে নিয়ে গিয়েছিল চীন সীমান্ত অতিক্রম করে। তখন ইন্দিরা গান্ধী আস্থাভাজন হতে পেরেছিলেন দেশবাসীর। সর্বশেষ আস্থা অর্জন করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী। দেশকে 'নিউক্লিয়ার পাওয়ারে' উন্নীত করেছিলেন তিনি প্রতিরক্ষার কথা চিন্তা করেই।

চীন সবদিক থেকেই ঘিরে ফেলছে ভারতকে। এমন কি পশ্চিম সীমান্তেও যুদ্ধ লাগলে চীনা সামরিক কর্তৃপক্ষই যুদ্ধ পরিচালনা করবে ভারতের বিরুদ্ধে যাতে পূর্বসীমান্তে অরুণাচল দখলের অভিলাষ পূর্ণ করতে পারে।

দিনের পর দিন বৈদেশিক দপ্তরের ক্লীবতা দেখতে দেখতে দেশবাসী হীনমন্যতার পাকে ডুবছে। কে উদ্ধার করবে তাদের?

চীনা সামরিক বিশেষজ্ঞর প্রত্যক্ষ তদারকিতে পাকিস্তানে বহু প্রতিরক্ষামূলক নির্মাণ করে নিয়েছে— বিনিময়ে পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরে চীনা সৈন্যদের রাখার ব্যবস্থা করেছে। চীন তাৎক্ষণিক ভাবাবেগে চলে না। ভারতের সঙ্গে আসন্ন সম্ভাব্য সামরিক মহড়ায় সে ভারতের অবশেষ সামরিক সামর্থ্য, পরিকল্পনার মূল্যায়ন করে নিতে চায় তাকে আক্রমণের পরিকল্পনায়। চৌ এন লাই ভারতে এসে নেহরুর সঙ্গে পঞ্চশীল অনুযায়ী আলাপ আলোচনায় সীমান্ত সমস্যা মিটিয়ে নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েও চীনে ফিরে গিয়েই ভারত আক্রমণ করে।

পাকিস্তান-চীন যৌথ আক্রমণের মোকাবিলা করবে কী করে, সে নিয়ে প্রতিরক্ষা দপ্তর আদৌ ভাবছে কি? না— চীন তার দৃষ্টিভঙ্গী পাল্টেছে এই অলীক চিন্তায় আচ্ছন্ন আছে!

ডিস্ট্রিবিউটর চাই, ডিস্ট্রিবিউটর চাই, ডিস্ট্রিবিউটর চাই, ডিস্ট্রিবিউটর চাই,

WANTED DISTRIBUTOR

ময়লার চরম শত্রু কাপড়ের পরম বন্ধু

গ্লোবাল ফাইটার

ডিটারজেন্ট পাউডার

প্রতিনিধিবিহীন এলাকায় ডিস্ট্রিবিউটরের জন্য

—ঃ যোগাযোগ করুন ঃ—

মোবাইল নং-০৩৩-৩২৬১০৩৪৫, ৯৬৮১৬০০৯৭৫

আপনার স্বপ্নগুলো যা-ই হোক ধাপে ধাপে তাকে বাস্তবায়িত করুন

MUTUAL FUND-এ SIP শুরু করুন।

প্রতি মাসে মাত্র 500 টাকা করেও শুরু করা যায়।

DRS INVESTMENT

Debashis & Subhasis Dirghangi
Mutual Fund/Insurance/ Fixed Deposit/ Pan Service/Mediclaim

facebook|http://facebook.com/debashislicmdrt

Mobile No. 9830372090/9433359382/81

সমাবেশ সমাচার

তিরুবনন্তপুরমে ভারতীয় সীমা জাগরণ মঞ্চের বৈঠক

গত ৯ ও ১০ ফেব্রুয়ারি কেরলের তিরুবনন্তপুরমে সীমা জাগরণ মঞ্চের অখিল ভারতীয় বৈঠক হয়ে গেল। অখিল ভারতীয় 'সীমা জাগরণ' ও 'ধর্মজাগরণ' প্রমুখ সেতু বাসুদেবনজী বলেন, সীমান্ত প্রণামের কার্যক্রমে দেশের যুবকরা সীমান্তে পৌঁছানোয় প্রশাসনের প্রতিরক্ষা বিভাগ নড়েচড়ে বসেছে। সীমা সৈনিকরা খুশি— তাদের সবরকম সমস্যা এই যুবকদের মাধ্যমে দেশবাসী জানতে পেরেছে।

অখিল ভারতীয় সাগর সীমা প্রমুখ গোপাল কৃষ্ণানজী দেশ রক্ষায় সাগর সীমার গুরুত্ব উল্লেখ করেন। তিনি জানান, অনেক জেলাশাসক জানেন না সাগরের ১২ মাইল তার শাসনের অন্তর্ভুক্ত। আরও ২০০ মাইলের ভিতর অন্য দেশের কোনও নৌযান বা অভিযান আন্তর্জাতিক আইন বিরুদ্ধ। উল্লেখ্য, এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন সাগর সীমা সংযুক্ত ১০টি প্রান্তের ৫৬ জন কার্যকর্তা ও কেরল প্রান্তের বহু মৎস্যজীবী সদস্য।

ব্রহ্মচারী জ্যোতির্ময় চৈতন্য মহারাজের শুভ জন্মদিবস পালন

গত ২৮ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের হুগলী বিভাগ সঙ্ঘচালক প্রয়াত ব্রহ্মচারী জ্যোতির্ময় চৈতন্য মহারাজের শুভ জন্মদিবস পালন করা হলো তাঁরই প্রতিষ্ঠিত দ্বারহাট্টা রাজেশ্বরী উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে। সকাল ৯টায় তাঁর মূর্তিতে বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে মাল্যদান করেন ডাঃ সনৎ বসুমল্লিক (সমাজ সেবা ভারতী), সঙ্ঘের প্রান্ত সহ সেবা প্রমুখ ধনঞ্জয় ঘোষ, বিজেপি-র পক্ষে সুন্দর পাল, এলাহাবাদ ব্যাংকের ম্যানেজার সুশান্ত চক্রবর্তী এবং ওই উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক গোপালচন্দ্র ঘোষ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গের প্রাক্তন বৌদ্ধিক প্রমুখ বাসুদেব ঘোষ। সারাদিন ধরে বিভিন্ন সেবামূলক কার্যক্রম হয়। ৯ জন মহিলা সমেত মোট ৫১ জন রক্তদান করেন। ৬৭ জনের চক্ষু এবং ২৫ জনের রক্ত পরীক্ষা করা হয়। ১০ জনের নিউরোথেরাপি চিকিৎসা করা হয়। ডাঃ জয় ব্যানার্জি, ডাঃ সতীশ রঞ্জন দত্ত, ডাঃ বনমালী ভড়, ডাঃ সুদীপ্ত হালদার ছাড়াও অনেক ডাক্তারবাবু উপস্থিত ছিলেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন চৈতন্য মহারাজের ছাত্র অদ্বৈত নাথ দে।

দ্বারহাট্টা শিশু মন্দিরের বার্ষিক উৎসব

গত ২৮ ফেব্রুয়ারি বিকেলে ব্রহ্মচারী জ্যোতির্ময় চৈতন্য সরস্বতী শিশু মন্দিরের ভাই বোনেরা স্কুল মাঠে বিদ্যালয়ের বার্ষিক উৎসব পালন করে। বিবেকানন্দ বিদ্যাবিকাশ পরিষদের প্রাদেশিক কার্যকর্তা বাসুদেব ঘোষ উপস্থিত ছিলেন। সভাপতি ছিলেন দ্বারহাট্টা স্কুলের প্রধান শিক্ষক গোপাল চন্দ্র ঘোষ। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন শিশু মন্দিরের ভাই ও বোনেরা। শেষে নাটক মঞ্চস্থ হয় 'অগ্নিবালক', সারাদিন ধরে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে দ্বারহাট্টা গ্রামের সমস্ত মানুষ একত্রিত হয়ে যোগদান করেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন তপন কুমার ভড়।

প্রয়াত ড. দিবাকর কুণ্ডুর স্মরণ সভা

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কলকাতা উত্তর ভাগ শাখার উদ্যোগে গত ১২ মার্চ সন্ধ্যায় কেশবভবনের সভাগৃহে প্রয়াত ড. দিবাকর কুণ্ডুর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। ড. কুণ্ডু উত্তর কলকাতা টালা শাখার স্বয়ংসেবক ছিলেন। সঙ্ঘ, বিদ্যার্থী পরিষদ ও ভারতীয় জনতা পার্টির বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। মিহির সাহা, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, অনিন্দ্যগোপাল মিত্র, প্রভাকর তেওয়ারী, প্রদীপ বোস, গোপাল দাস ও কলকাতা মহানগর সহসঙ্ঘচালক সুশীল কুমার রায় প্রমুখ ডঃ কুণ্ডুর কর্মময় জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। সভা পরিচালনা করেন বিভাস মজুমদার।

আগরতলায় সেবাধামে রুদ্রমহাযজ্ঞ

প্রতি বছরের ন্যায় এবছরও ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলার সেবাধামে শিবচতুর্দশী উপলক্ষে ২ দিন ধরে রুদ্রমহাযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় সাত হাজার ধার্মিক নরনারী এতে অংশগ্রহণ করে প্রসাদ গ্রহণ করেন। কার্যক্রমে বিশেষ উল্লেখনীয় যে 'পরমার্থ সাধনা ১ম খণ্ড' পুস্তক উন্মোচন করেন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের আগরতলা শাখার পূজ্য স্বামী নারায়ণ ব্রহ্মচারী। পুস্তকটির বিষয়বস্তু শিবমহিমা সংক্রান্ত। শ্রীশ্রী সেবাধাম পরমার্থ ন্যাস পুস্তকটি প্রকাশ করেন।

রাজ চক্রবর্তীর ‘কানামাছি’

বিকাশ ভট্টাচার্য

আজকাল একটা ছবির শ্যুটিং শুরু হওয়ার সময় থেকেই চলে তার প্রচারাভিযান। ফলে দর্শকদের আগ্রহও সেই ছবিটার ব্যাপারে বাড়তে শুরু করে। বিশেষ করে পরিচালক যদি বলেন তিনি একটা পলিটিক্যাল থ্রিলার বানাচ্ছেন! হিন্দিতে অর্ধসত্য বা প্রকাশ ঝার ছবিগুলো আমরা দেখেছি। কিন্তু বাংলায় আপনজন, আতঙ্ক বা গণশত্রু ছাড়া তেমনভাবে রাজনীতি নিয়ে ছবি করেছেন— তাও আবার বাণিজ্যিক ছবি, এমনটা দেখিনি। তাই রাজ চক্রবর্তী পুরোদস্তুর বাণিজ্যিক তকমা দেওয়া ছবি করিয়ে হলেও, ওঁর সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত ‘কানামাছি’ ছবিটা দেখতে গিয়েছিলাম।

ছবির শুরুতেই দেখা যাচ্ছে এক ব্যাঙ্ক ডাকাতি। পেশায় চিত্র সাংবাদিক আবির (অভিনয়ে অঙ্কুশ) সেই দৃশ্য ক্যামেরাবন্দী করে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। কয়েকজন ধরাও পড়ে। আবিরের কাগজের অফিসেই যোগ দেয় নয়না (অভিনয়ে শ্রাবন্তী)। সে ক্রাইম জার্নালিস্ট। সারাদিন ঘোরে দুষ্কৃতিদের পেছনে। জোগাড় করে বিরোধীদলের নেতার অনেক গোপন খবর। যা নেতার ভাবমুর্তিকে কলুষিত করতে যথেষ্ট। ছবির অনেকটা অংশ জুড়ে আছে সাংবাদিকদের কাজকর্ম। যাকে ইনোভেটিভ জার্নালিজম বলা যায়। এই অংশে আর এক সাংবাদিক পায়েল (নবাগতা সায়নী অভিনয় করেছে)। আর আছে একদল তাজা তরুণ আদর্শবাদী ছাত্র-ছাত্রী। যাদের নেতা অভিমন্যু (অভিনয়ে আবির চট্টোপাধ্যায়)। এরা মনে করে রাজনৈতিক দল আর নেতাদের কিছু আর দেওয়ার নেই। সবাই করাপ্ট। মানুষের ভালো করতে তাই যুবসমাজকেই এগিয়ে আসতে হবে। এদের সংগঠনের নাম ‘বর্ণপরিচয়’। স্লোগান ‘চাই না অন্ন, চাই না বস্ত্র। অ আ ক খ-ই আসল অস্ত্র’। সমাজসেবার মধ্যে দিয়ে এরা রাজনীতিতে ঢুকে পড়ে। ভোটে দাঁড়ায় এবং জিতেও যায়। মুখ্যমন্ত্রী হয় অভিমন্যু। এই প্রতিবেদকের মনে পড়ে যাচ্ছিল গত শতকের সত্তরের দশকের গোড়ায় গুজরাতে এমনই ছাত্র-যুবরা গড়ে তুলেছিল ‘নব নির্মাণ সমিতি’ যা গুজরাতে এক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, উদ্বুদ্ধ করেছিল জয়প্রকাশ নারায়ণকে কংগ্রেসী স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করতে। সে তো আজ ইতিহাস! তবে সাম্প্রতিক উদাহরণও আছে। বাংলাদেশের শাহবাগ।

পরিচালক রাজ চক্রবর্তী ছবির বিষয়টা ভালোই বেছেছিলেন। শুরুটাও ভালোই করেছিলেন। কিন্তু মনে হয় অর্ধেকটা শ্যুটিং করার পর মনে পড়ে গিয়েছিল তাঁর ঘরানার কথা। বা প্রযোজক এম কে মুভিজের অশোক ধানুকা ও হিমাংশু ধানুকা রাজকে মনে করিয়ে দিয়েছিলেন তাঁদের ঘরানার কথা। বলেছিলেন ওসব পলিটিক্যাল থ্রিলার হলেও বম্বে থেকে যে বাবা যাদবকে আনা হলো তার কি হবে? তাই এইরকম এক গুরুগম্ভীর বিষয়ের মধ্যে নায়ক-নায়িকা অর্থাৎ অঙ্কুশ আর শ্রাবন্তী চলে গেল বিদেশে নাচের দৃশ্য শ্যুটিং করতে। এখনকার বাংলা বাণিজ্যিক ছবির যে তিনটি শর্ত অর্থাৎ বিদেশের মাটিতে অবাস্তব নৃত্য, ভায়োলেন্স এবং মেলোড্রামা— ছবিতে এসবই এসেছে গতানুগতিক বাংলা ছবির মতোই। পরিচালক প্রত্যাশা জাগিয়েও আশায় জল ঢেলে দিলেন শেষ দিকে কাহিনীতে টুইস্ট এনে। এ যেন গাছে তুলে মই কেড়ে নেওয়া। ইন্দ্রদীপ দাশগুপ্তের মেলোডির মাঝে ঋষি চন্দের জগঝম্প কান ঝালাপালা করে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। মানরক্ষা করেছেন সম্পাদনায় রবিরঞ্জন মৈত্র। আর ছবির অপূর্ব ফোটোগ্রাফি।

ছবির প্রধান সম্পদ অভিনয়। শ্রাবন্তী এ ধরনের চরিত্রে কখনও অভিনয় করেননি। কিন্তু এ ছবিতে তাঁর অভিনয় খুব ভালো। নবাগতা সায়নী রাজেরই টিভি সিরিয়ালে মুখ দেখিয়েছেন। এ ছবিতে তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত অভিনয় দেখার মতো। নবাগত অঙ্কুশের এটা দ্বিতীয় ছবি। খুব সাবলীল অভিনয় করেছে। এর ভবিষ্যৎ আছে। আবির ছাত্রনেতা থেকে রাজনৈতিক নেতার অভিনয় ভালোই করেছে। শেষদিকে তাঁর অভিনয় সত্যিই দেখার মতো। এছাড়া শঙ্কর, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, রজতাভ দত্ত, সুপ্রিয় দত্ত এঁরা চরিত্র অনুযায়ী যথাযথ।

শব্দরূপ-৬৬২ ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া

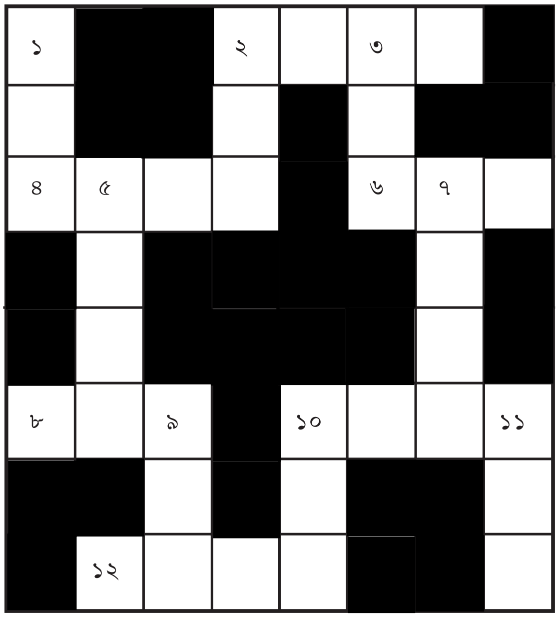

সূত্র :

পাশাপাশি : ২. সূতিকাগৃহে যে নারী প্রসবকাল হইতে প্রসূতির শিশুকে লালন করে, ৪. আকাশে দৃশ্যমান বহু দূরস্থ নীহারপুঞ্জ সদৃশ বাষ্পীয় পদার্থ বা নক্ষত্রসমষ্টি, ৬. রুদ্রবীণা, ৮. বড় এক প্রকার লেবু, ১০. সূর্য, ১২. অষ্টবর্ষীয়া কন্যাকে বিবাহার্থে সম্প্রদান।

উপর-নীচ : ১. দুর্গা, ২. নলখাগড়া, শরফুলের গাছ, ৩. তৃণধান্য, ৫. নূতন বৎসরের হিসাবের খাপ, ৭. বিষ্ণু, শ্রীকৃষ্ণ, ৯. বিদ্যুৎ, বিজলী, ১০. জনহীন, ১১. সুন্দর পক্ষবিশিষ্ট পক্ষী; গরুড়।

সমাধান
শব্দরূপ-৬৫৯
সঠিক উত্তরদাতা
শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯

শূ	দ্র		পা	ঞ্চ	জ	ন্য	
দ্র			র্ব		ন্মা		
ক	লা	ব	তী		ষ্ট		
	ল			প্র	মী	লা	
	ন	হু	ষ			গা	
		ল		ম	ক	ম	ক
		স্থু		ন্দু			ম
	ক	ল	ন্দ	রা		লী	লা

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়। খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

৬৬২ সংখ্যার সমাধান আগামী ২২ এপ্রিল, ২০১৩ সংখ্যায়

বহুত্বের মধ্যে একত্বই প্রকৃতির ব্যবস্থা, হিন্দুগণ এই রহস্য ধরিতে পারিয়াছেন। অন্যান্য ধর্ম কতকগুলি নির্দিষ্ট মতবাদ বিধিবদ্ধ করিয়া সমগ্র সমাজকে বলপূর্বক সেগুলি মানাইবার চেষ্টা করে। সমাজের সম্মুখে তাহারা এক মাপের জামা রাখিয়া দেয়; জ্যাক জন হেনরি প্রভৃতি সকলকেই ঐ একই মাপের জামা পরিতে হইবে। যদি জন বা হেনরির গায়ে না লাগে, তবে তাহাকে জামা না পরিয়া খালি গায়েই থাকিতে হইবে।

— স্বামী বিবেকানন্দ
(বাণী ও রচনা, ১/২৫)

সৌজন্যে : জনৈক শুভানুধ্যায়ী

মাছের বর্জিত অংশ দিয়ে অল্প খরচে সার উৎপাদন

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ পরিবেশ বিজ্ঞানীরা বার বার বলছেন চাষের জমিতে যথেচ্ছ রাসায়নিক সার প্রয়োগের কুফলের মাশুল দিতে হবে আগামীদিনে দেশবাসীকে। অধিক ফসল উৎপাদনের জন্যে ক্ষেতে খামারে উৎসাহের প্রাচুর্য যথেষ্ট। রাসায়নিক সার প্রয়োগের দরুন কৃষি উৎপাদন বেড়েছে। সেইসঙ্গে দেখা দিয়েছে অনেক রকম সমস্যা।

১. উৎপাদিত পণ্যের গুণমান কমছে। ২. কৃষিকাজে জড়িত ব্যক্তিদের স্বাস্থ্যের ক্ষতি হচ্ছে। ৩. যথেচ্ছ সার ব্যবহারে মাত্রাতিরিক্ত উৎপাদনের ফলে জমির ক্ষতি হচ্ছে দ্রুত।

অনেকেই বলছেন, এখন আর খাবারদাবারে আগের মতো স্বাদ পাই না। পুষ্টিমূল্য কমে গেছে। কথা শুনে মনে হতে পারে কিছু মানুষ গতদিনের সবকিছু ভালো এমন মনে করেই বলে থাকেন। কথাটা পুরোপুরি না হলেও আংশিক সত্য। অধিক উৎপাদনের প্রয়োজন হয়েছে দেশে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার কথা ভেবে। 'সকলের জন্যে খাদ্য' প্রথম কথা। রাষ্ট্রের অঙ্গীকার জাতীয় স্তরে। খাদ্য না পেলে যে সংকট দেখা দেবে তা ভয়ঙ্কর। আমাদের দেশের মানুষ মন্বন্তর দেখেছে। অনেক সময়েই তা ছিল মানুষের তৈরি। ১৯৪৩ সালে বা ১৩৫০ সালের দুর্ভিক্ষ সেরকমই। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর দেখা গেছে বিপুল জনসমষ্টির সকলের মুখে দুবেলা কেন একবেলা খাবার জোটানো যাচ্ছে না। আধপেটা খেয়ে দিন কাটছে বহু মানুষের। নিরন্ন মানুষের মিছিল দেখার পর বলা যায় না পুষ্টির কথা। আগে পেটপুরে খাওয়াটাই জরুরি। পুষ্টি আসবে পরে। এক সময় বিদেশ থেকে খাদ্য আমদানি করতে হয়েছে খাবারের সংকট সামাল দেওয়ার জন্যে। সে সময় বিজ্ঞানীরা বলেছেন, যে পদ্ধতিতে চাষবাস হচ্ছে তাতে জমিতে বেশি উৎপাদন হবে না। কৃষি সম্পর্কে ধারণা পুরোপুরি বদলাবার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে জাতীয় স্তরে। উন্নত জাতের বীজ সার যাতে কৃষকের নাগালে পৌঁছোয় তা ভাবার সঙ্গে সঙ্গে পুরনো ধরনের চাষ পদ্ধতি বদলাবার কথা বোঝানো গেছে। কৃষিক্ষেত্রে অতি আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে উৎপাদন বেড়েছে। তার ফলে আজ দেশ খাদ্যশস্যে স্বনির্ভর হতে পেরেছে। দেশের খাদ্যভাণ্ডার এখন পূর্ণ। এই সময়ে বিজ্ঞানীরা বলছেন, কৃষিক্ষেত্রে রাসায়নিক সার প্রয়োগ না করে বা তার ব্যবহার কমিয়ে জৈব সারের সাহায্য নিলে অনেক রকম সুবিধে পাওয়া যায়। কৃষি উৎপাদন কমবে না জৈব সার ব্যবহারে। উৎপাদিত পণ্যের গুণমান কমবে না। চাষবাসের কাজে জড়িত ব্যক্তিদের কোন ক্ষতি হবে না। জমির কোনও ক্ষতি হবে না বরং উর্বরতা শক্তি বাড়বে। এসব ভাবনা শুধু কাগজপত্রে বা মস্তিষ্কে বন্দী থাকেনি। প্রয়োগ করে দেখা গেছে যথেষ্ট সহায়ক ভূমিকা জৈব সারের। এখন কৃষিবিজ্ঞানীরা দেখেছেন, মাছের যেসব অংশ ফেলে দেওয়া হয় তা থেকে খুব ভালো সার তৈরি হতে পারে। সে সার ব্যবহার করলে উৎপাদন তো বাড়বেই, খরচও কম। এর ফলে কৃষকদের চাষের ব্যয় কমবে। উৎপন্ন সামগ্রীর গুণমান উন্নত হবে। স্থানীয়ভাবেই এই উদ্যোগ নেওয়া যায়। দেশের নামী রাসায়নিক সার উৎপাদন সংস্থার উপর ভরসা করে না থাকলেও চলবে।

তামিলনাড়ুর ন্যাচারাল রিসোর্সেস ডেভালাপমেন্ট সংস্থা বলেছে, দেশের ৮০ শতাংশই ক্ষুদ্রচাষী। তাঁদের কাছে এধরনের উদ্যোগের মূল্য যথেষ্ট। গবাদি পশুর মলমূত্র থেকে সার তৈরির ব্যাপারটা জানা। কিন্তু দেশের সব প্রান্তিক চাষীর বাড়িতে গবাদি পশু নেই। ফলে ওই ধরনের সারের মূল্যও কম নয়। এখন যে প্রযুক্তির কথা বলা হচ্ছে তাতে প্রথমভাগে সার প্রয়োগের গুরুত্ব পাচ্ছে যাতে পুষ্টির দিকটা বজায় থাকে। মাছ পাওয়া যায় সারা বছর। বর্ষার সময় আর তার পরে প্রচুর পরিমাণ মাছ মেলে। মাছের যে অংশ খাওয়া যায় না তা দেশের সর্বত্র পাওয়া যায়। বিশেষ করে হাটে-বাজারে এবং রান্নাঘরে। ওইসব বর্জ্য জিনিস নিয়ে সমস্যাও কম নয়। অথচ ওইসব মাছের বর্জিত অংশের যথেষ্ট পুষ্টি গুণ রয়েছে। এসব জিনিস ২৪ ঘণ্টার বেশি রাখা যায় না। ওই উপকরণ দিয়ে সার তৈরির কথা ভাবা হয়েছে। এতে দূষণ বন্ধ হবে। বর্জ্য পদার্থ ফেলা নিয়ে সমস্যা দেখা দেবে না।

বলা হয়েছে, ২০ কিলোগ্রাম মাছের ফেলে দেওয়া অংশ ৪০ লিটারের একটা প্লাস্টিকের পাত্রে রাখা যায়। তার সঙ্গে দশ লিটার জল মেশানো হয়। মেশানো হয় কাঁচা পেঁপের খোসা। সব মিলিয়ে রাখা হয় পাঁচ থেকে আট ঘণ্টা। তারপর তা বন্ধ রেখে লক্ষ্য করা হয়। এছাড়া চার কিলোগ্রাম গুড়ের জলে মাছের বর্জিত অংশ মিশিয়ে ১৫-২০ দিন রাখলে তা অন্যরকম রূপ নেবে, যা মাঠে ব্যবহার করলে চাষের কাজে উপকার হবে। সার হিসেবে ব্যবহারের আগে ছেঁকে নেওয়া যায় কাপড়ে। তারপর তা ক্ষেতে খামারে ব্যবহারের উপযোগী হবে। ২৫০ থেকে ৫০০ মিলিগ্রাম সামগ্রী ১০ লিটার জলে মেশানো যায় ছড়াবার আগে। চাষীদের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে বিকেল চারটের পর ব্যবহার করলে ভালো ফল মিলবে। আপাতত এই সার সবরকম আনাজ ক্ষেতে, ফুলের বাগানে ব্যবহার করতে বলা হয়েছে। এবং দেখা গেছে সুফল মিলছে ওই সার প্রয়োগের ফলে। রাসায়নিক সারের লিটার পিছু দাম তিনশো টাকা। ওই সার পাওয়া যাবে ৪০-৫০ টাকায়। আর পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার ক্ষেত্রেও যা সহায়ক, নিরাপদও। কিছু সংস্থার পক্ষ থেকে ড. কমলেশ্বর পিল্লাই বলেছেন, আমরা পরীক্ষা চালাচ্ছি ওই সার চাষের জমিতে ও কলা উৎপাদনের ক্ষেত্রে কতটা কার্যকর হয়। কন্যাকুমারীর বিবেকানন্দ কেন্দ্র ন্যাচারাল রিসোর্সেস ডেভালাপমেন্টের এই উদ্যোগ যাতে দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে তা নিয়ে ভাবছে।

—ঃ BSNL-এর কর্মীদের প্রতি আবেদন ঃ—

আগামী ১৬ এপ্রিল, ২০১৩ বিএসএনএল-এর সর্বত্র গ্রুপ সি এবং ডি কর্মচারীদের গোপন মতদানের মাধ্যমে প্রতিনিধিত্ব মূলক ইউনিয়নের নির্ধারণ হতে চলেছে। ১৮টি ইউনিয়ন এই মতদানে অংশগ্রহণ করছে। এর মধ্যে বেশিরভাগ ইউনিয়নই গত ১২ বছর ধরে বিএসএনএল-এ যারা ১নং এবং ২নং ইউনিয়ন হিসেবে রয়েছে তাদের জোটের মধ্যে বিভক্ত হয়েছে। এই বিএসএনএল ২০০০ সালে ১৬০০০ কোটি টাকার নীট মুনাফা করেছিল এবং বর্তমানে বিএসএনএল ৫০০০ কোটি টাকার এক রুগ্ন শিল্পে পরিণত হয়েছে। এই বিশাল লাভজনক শিল্পের রুগ্ন শিল্পে পরিণত হওয়ার সময়কালে যে দুই উইনিয়ন ১নং এবং ২নং হিসেবে গত ১২ বছর ধরে কর্মচারীদের রক্ষা করার নামে সর্বনাশ করল তারা উভয়েই লাল ঝাণ্ডাধারী এবং বামপন্থী মনোভাবাপন্ন।

এই সময়কালের মধ্যে বিএসএনএল কর্মচারীরা **OT, Medical, LTC** এবং সর্বোপরি বোনাস থেকে বঞ্চিত হয়েছে। ২০০২ এবং ২০০৪ সালের নির্বাচনে ভারতীয় মজদুর সংঘ অনুমোদিত ইউনিয়ন মোটামুটি ভালো অবস্থানে থাকলেও পরবর্তীকালে বিএসএনএল-এ দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতারা স্থান পরিবর্তন করায় ২০০৬ সালের নির্বাচনে ভারতীয় মজদুর সংঘ অনুমোদিত কোনও সংগঠন নির্বাচনে দাঁড়াতে সক্ষম হয়নি। পরবর্তীকালে বিএমএস-এর কেন্দ্রীয় নেতৃত্বর সহযোগিতায় বিটিইইউ বিএসএনএল ২০০৯ সালে প্রথম এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। বিরোধীরা শক্তি সঞ্চয় করে ২০১১ সালের নির্বাচনে বিটিইইউ বিএসএনএল শতকরা প্রায় ৩ ভাগ ভোট পায়। এই বছর বিএসএনএল কর্তৃপক্ষ যে কোড অফ ডিসিপ্লিন রচনা করেছে তাতে সর্বভারতীয় স্তরে ন্যূনতম ২৯০ ভোট যে ইউনিয়ন পাবে তারাই স্বীকৃত ইউনিয়ন হবে।

কলকাতা এবং পশ্চিমবঙ্গ এবং আসাম, **NE-I, NE-II** সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলে আমাদের সমস্ত শুভানুধ্যায়ীদের কাছে আবেদন যে পরিবার, পরিজন, পরিচিত যত বিএসএনএল-এর কর্মচারীরা ভারতবর্ষের যেখানেই কাজ করাক না— তারা যেন ৩নং সিরিয়ালে এই ভোট দিয়ে বিএসএনএল-কে বাঁচানোর এই লড়াইতে আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করেন।

সভাপতি/BTEV BSNL	**সম্পাদক/BTEV BSNL**
শ্রী মানবেন্দ্র সাহা	শ্রী কে. কে. মিত্র
9433314136	**9477322455**

M - 9933967518 ভারত সরকার দ্বারা অনুমোদিত M - 9933967518

সৃষ্টি কম্পিউটার স্বাক্ষরতা মিশন™

An ISO 9001 : 2008 Certified Organization

Computer Courses	Distance Courses
Basic , Internet D.T.P. Hardware,Multimedia, FA,Teacher Tranning Mobile Reparing	BA, MA, B.Com, M.Com, B.Sc. , M.Sc., BSW, MSW,B.Lis, M.Lis,BCA, MCA,BSc.-IT, MSc.-IT,BBA, MBA

City Office : Garia,Srinagar Main Road, Kol-700094
Regd. Office : Vill+P.O.- Kashinagar, P.S.- Raidighi, Pin-743349

SCSM –এর অনুমোদিত কম্পিউটার সেণ্টার খোলার সুবর্ণ সুযোগ।

Want : New Franchise , Agent ,Officer ■ Website: WWW.SCSM.CO.IN

Swastika RNI No. 5257/57 Postal Registration No. Kol. RMS/48/2013-2015
25 March - 2013